বাঙ্গালার সমস্যা

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী কার্য্যালয়
২০।২ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

মূল্য আট আনা মাত্র

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী-প্রেস
হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিবেদন

কলিকাতা
১১ই এপ্রিল, ১৯২৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"বাঙ্গালার সমস্যা" আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। কি কি কারণে বাঙালী জাতি এমন মস্তিষ্কশালী হইয়াও জীবন-সংগ্রামে অবাঙালীর প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতেছে তাহা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরীক্ষা পাশ করিতেই বাঙালী যুবকের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা লইয়া বাহির হইয়া আসিলে সে এক প্রকার অন্তঃসারশূন্য ও ভগ্নস্বাস্থ্য। তাহার আর কিছুই অভিনব পন্থা অবলম্বন করিবার সাধ্য থাকে না। ওকালতি ও ডাক্তারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা বা চাকুরির উমেদার হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। আমাদের সামাজিক ব্যাধিও অনেক—বলিতে গেলে আমাদের সমাজে ঘুণ ধরিয়াছে। আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। প্রবন্ধে এই সকল বিষয় যথোচিত আলোচিত হইয়াছে। আমার মতে এই প্রবন্ধ

স্বদেশবাসীর সেবাকরণেচ্ছু
জনৈক ‘বাঙ্গালী’র
নিবেদন

বাঙ্গালার সমস্যা

চিন্তাশীল বাঙ্গালী মাত্রেই আজকাল বাঙ্গালা দেশের আর্থিক ও সামাজিক দুরবস্থা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন্। প্রত্যেক বাঙ্গালীর এসম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত এবং যাহার যতটুকু সাধ্য উন্নতির সাহায্য করা উচিত। সুখের বিষয় অনেকেই তাহা করিতেছেন। কিন্তু ব্যাধির গুরুত্বের তুলনায় উপস্থিত বিধিব্যবস্থার পরিমাণ অতি অল্প, অথচ প্রয়োজন অনেক বেশী।

বাঙ্গালার বা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর, এই দুরবস্থার নানা কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। এই সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিতেছি। বিলাতে গরু-ঘোড়ার খাদ্যের জন্য ক্লভার নামক শস্য চাষ করা হয়। কোন স্থানে দেখা গেল এই শস্যের বীজ হইতেছে না। দূর দেশ হইতে বীজ না আসিলে শস্য জন্মান দুষ্কর। অনুসন্ধানের ফলে বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন যে, সে-স্থানে যথেষ্টসংখ্যক অবিবাহিতা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের অভাবই বীজ না হওয়ার কারণ। কারণটি প্রথমে হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, এক প্রকার ভ্রমর এই শস্যের ফুলের পরাগ ও মধু আহরণ করে। এক ফুল হইতে মধু ও পরাগ লইয়া যখন ভ্রমর অন্য ফুলে যায় তখন আহরিত পরাগের কিছু অন্য ফুলের গর্ভকেশরে লাগিয়া তবে বীজোৎপত্তি হয়। অপর ফুলের পরাগ ব্যতীত ফুলে বীজোৎপত্তি হইতে পারে না। সেখানে এই ভ্রমরের সংখ্যা অতি অল্প এবং অল্পসংখ্যক ভ্রমর সমস্ত ফুলে ভ্রমণ করিতে পারে না। এই কারণে অতি অল্প ফুলেই বীজ হয়। ভ্রমরের সংখ্যার অল্পতার কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, ভ্রমরেরা মাটির

ভিতর বাসা করে এবং ইঁদুরে তাহাদের বাসা নষ্ট করে ও বাচ্চা খাইয়া ফেলে। সেখানে অন্য স্থান অপেক্ষা ইঁদুরের প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহাদের সংখ্যাধিক্যের কারণ—ইহাদের ধ্বংসকারী বিড়ালের অভাব। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরাই এদেশে বিড়াল পোষে। এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম, অতএব বিড়ালের সংখ্যাও কম। এখন ক্লভার শস্যের বীজ না হওয়ার কারণ কোথায় গিয়া দাঁড়াইল! এই পৃথিবীর জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা ও খনিজ পদার্থ প্রভৃতি সকলই এমনভাবে জড়িত যে, ইহাদের কোন-একটির ব্যবহার বা ব্যবস্থা বদলাইলে অপর অনেকের ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়, যেমন পায়ের কড়ে আঙুলের ফোড়ার দরুণ সমস্ত শরীরেরই ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুরবস্থার যে সঠিক কারণ কোথায় তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। ইহার সহিত সামাজিক আচার-ব্যবহার, খাদ্য, ধর্ম্মবিশ্বাস, শিক্ষা, রাজ-নৈতিক অবস্থা এবং অনাচার প্রভৃতি সকলই জড়িত। রেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দরুণ পৃথিবীর জাতিসমূহ এক বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইতেছে। সকল জাতিরই বাহিরের সম্বন্ধও উন্নতি-অবনতির সহিত কিরূপে জড়িত তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—আধুনিক যন্ত্রচালিত শিল্পের সংঘর্ষে আসিয়া আমাদের শিল্পের অবনতি ও লোপ। অতএব চারিদিক উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকল দিকেরই উন্নতি আবশ্যক। সকল দিকে নজর না রাখিলে কোন একদিকের বহুল প্রচেষ্টাও নিষ্ফল হইতে পারে। যে-সকল বিষয়ে উন্নতির প্রয়োজন সেগুলিকে সমস্যা বলিতেছি। ইহাদের সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য এবং আশা, যে, যোগ্যতর দেশহিতৈষী ব্যক্তি এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবেন। সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ না হোক অন্ততঃ

আংশিক সমাধানের যে পন্থা লেখকের মনে উদয় হইয়াছে তাহাও পুস্তিকার শেষ ভাগে নিবেদন করা হইয়াছে। এই পন্থা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই লেখক ইহা প্রচারে অগ্রসর হইয়াছে।

অর্থসমস্যা

আমাদের অর্থসমস্যা কত কঠিন এবং আমরা যে কত গরীব তাহা ধারণা করা যায় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গড়-পড়তায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রবাসী প্রত্যেক নর-নারীর দৈনিক আয় তের-চৌদ্দ টাকা, প্রত্যেক ইংরেজ নর-নারীর সাতটাকা, আর ভারতবর্ষের লোকের দুই আনা! এই হিসাবে ব্যবসা ও কলকারখানায় উন্নত ধনী বোম্বাই প্রদেশের লোকদিগকেও ধরা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লোক যে কত দরিদ্র তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। আমাদের কত লোক যে অর্দ্ধাশনে ও অনশনে এবং একমাত্র কৌপীন পরিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেশের আর্থিক উন্নতি হয় কৃষিশিল্প ও ব্যবসার দ্বারা, বাঙ্গালী শিল্প ও বাণিজ্য হইতে হটিয়া গিয়াছে, কৃষি ব্যতীত চাকুরিই এখন বেশীর ভাগ বাঙ্গালীর অর্থাগমের উপায়, গৃহস্থের কাজ করিবার জন্য যেমন চাকর-ঝি দরকার, জমিদারীর কাজ চালাইবার জন্য যেমন নায়েব-গোমস্তা আবশ্যক, সেইরূপ দেশের সরকারী কাজ চালাইবার জন্যও কতক লোক প্রয়োজন, যথা—দারোগা, মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, লাট প্রভৃতি। এই সকল চাকুরিজীবী দ্বারা দেশের অর্থাগম হয় না, বরং ইহাদের বেতনাদির জন্যই অর্থব্যয় হয়। উকিল ডাক্তার প্রভৃতিও একরকম চাকুরিয়া।

শিল্প ও ব্যবসা হইতে বাঙ্গালীর হটিবার প্রধান কারণ হইতেছে যে,

যাহারা পাশ করা 'শিক্ষিত' তাহারা কেরাণী হইলেও সমাজে "'ভদ্র' এবং যাহারা শিল্পী দোকানদার বা ব্যবসাদার তাহারা 'অভদ্র' বিবেচিত হইতে লাগিল। যে শিক্ষিত হইল, শিল্প দোকানদারী বা ব্যবসা তাহার পৈত্রিক হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া চাকুরি, ওকালতী, মোক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন শীঘ্র শীঘ্র হওয়ায় এবং ইংরেজীর জ্ঞানে চাকুরি সুলভ হওয়ায় এই শিক্ষার দ্বারা চাকুরি লইয়া ভদ্র হওয়া সকলেরই লক্ষ্য হইল। শুধু যে আমাদের দেশেই এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে; বিলাত আমেরিকাতেও এইরূপ 'ভদ্র' ও 'অভদ্রের' ভাব এখনও বর্ত্তমান এবং ইহা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস চলিতেছে। আমেরিকায় পরিষ্কার পরিচ্ছদধারী শিক্ষিত ব্যাঙ্কের কেরাণী সাত দিনে যত রোজগার করে, একজন রাজমিস্ত্রির দুই দিনে তাহা অপেক্ষা বেশী আয়। অতএব কাজের পর সন্ধ্যাবেলায় রাজমিস্ত্রি কেরাণী অপেক্ষা বেশী বাবুগিরি করিতে পারে। এই কারণে ঐ সকল দেশে সমাজের এই ভ্রান্ত 'ভদ্র' ও 'অভদ্র' ধারণা যত শীঘ্র দূর হইতেছে আমাদের দেশে জাতিভেদের দৃঢ় গণ্ডীর দরুণ তত শীঘ্র হইবে না। তবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে রাজমিস্ত্রি, ছুতার, তাঁতী, মালীরাও কেরাণী প্রভৃতি 'শিক্ষিত'শ্রেণীর সমান "ভদ্র" বিবেচিত হয় ঐ সকল দেশে এখন তাহার চেষ্টা চলিতেছে এবং যাহাতে কেবল ব্যবসার দিকে ঝোঁকের দরুণ প্রকৃত শিল্পবাণিজ্য উপেক্ষিত হইতে না পারে তাহারও চেষ্টা চলিতেছে।

পূর্ব্বে ভারতের উত্তরাঞ্চলে বাঙ্গালী অনেক চাকুরি পাইত। উচ্চ বেতনভোগী বাঙ্গালীকে দেখিয়া কোন কোন স্থানে এখনও লোকের ধারণা যে বাঙ্গালীদের মধ্যে গরীব নাই। বাঙ্গালী গেল ঐ সকল

প্রদেশে চাকুরি করিতে, আর ঐ সব প্রদেশের লোক বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার ব্যবসা দখল করিয়া বসিল। এখন সকল প্রদেশেই আইন করিয়া বাঙ্গালীর চাকুরির পথ বন্ধ হইতেছে। যদিও চাকুরি সম্বন্ধেও বাঙ্গালার দ্বার অপর সকল প্রদেশের লোকের পক্ষে অবারিত। দেশেই বা আর কত চাকুরি জুটিবে? ফলে—বাঙ্গালীর ঘরে আজ অন্নাভাব। চাকুরীর চরম হইয়াছে। এই সুদূর ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী আসিয়াছে চাকুরি, ওকালতী, ডাক্তারী করিতে, আর মাড়োয়ারী, সুরাটী, গুজরাটী, দিল্লীওয়ালা, এমন কি, বহু মাদ্রাজীও আসিয়াছে ব্যবসা করিতে, সমস্ত ব্যবসাই প্রায় ইহাদের ও চীনাদের হাতে।

একবার গোয়ালন্দ হইতে রেলে কলিকাতা আসিতেছিলাম। কুষ্টিয়া ষ্টেশনে এক মাড়োয়ারী তাঁহার পাঁচ ছয়টি পুত্র সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পুত্রগণের বয়স ছয়-সাত হইতে সতের-আঠার। দশ-এগার বৎসর বয়স্ক একটি বালক আমার পাশে বসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে তাহার পিতার কাপড়ের দোকানে বসে এবং নিজেদের ভাষা শিক্ষা করে, কখনও কখনও কেহ না থাকিলে কাপড় বিক্রয়ও করে। ভবিষ্যতে কি করিবে জিজ্ঞাসা করিলে সে বুক ফুলাইয়া জোরের সহিত বলিল, 'আমিও দোকান করিব, বড় বড় ব্যবসা করিব।' ইহাদের সাধনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ হয়। মাত্র লোটাকম্বলই লক্ষপতি হইতে সহায়তা করে। ব্যবসা করিতে টাকা কোথা পাইব বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকে না।

বাঙ্গালীর ছেলের আদর্শ ও আশা কি? বাপ, খুড়া, জ্যেঠা, বা প্রতিবেশী কেহ উকিল, ডেপুটী, ষ্টেশন মাষ্টার, বা শিক্ষক, বা কেরাণী। ছেলেদের আশা, জোর ডেপুটী, না হয় উকিল, বড় জোর হাইকোর্টের জজ হইব। ডেপুটী জজ হয় কয়টা?—সকলেরই লক্ষ্য

একটা চাকুরি। চাকুরি ছাড়া গতি নাই। লেখাপড়ায় পাশ ছাড়া চাকুরি হয় না, অতএব অবস্থায় না কুলাইলেও যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পাশের পর পাশ ত আগে কর, তারপর যাহা-হোক একটা চাকুরির চেষ্টা। চাকুরিই বা মিলিবে কত? এখন বাঙ্গালার যেখানেই যান দেখিতে পাইবেন কত যুবক বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া বেকার বসিয়া আছে, রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাঙ্গালীর এই চাকুরিরূপ সাধনার ফল এই হইয়াছে যে, এদেশেই একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় আসিয়া ব্যবসায়ে কয়েক বৎসরেই মাড়োয়ারী লক্ষপতি হয়। গুজরাটী, ভাটিয়া, দিল্লী-ওয়ালা প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা বাঙ্গালা দেশেই ব্যবসা করিয়া গাড়ী-জুড়ী হাঁকায়, ইন্দ্রপুরী-তুল্য বাড়ীতে বাস করে, আর বাঙ্গালী—ঈশ্বরের দান যে আলো ও বাতাস—তাহারও অভাব অনুভব করে।

চাকুরীর কুফল

চাকুরিপ্রিয়তার দরুণ বাঙ্গালী দরিদ্র হইয়াছে, তাহা ছাড়া জাতীয় চরিত্র হীন হইয়া পড়িতেছে। পদস্থ ব্যক্তিকেও নিজ পুত্র বা আত্মীয়ের চাকুরির জন্য নিম্ন পদস্থ ব্যক্তির উমেদারী করিতে দেখা যায়।

বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়াও বাঙ্গালী-যুবক সামান্য বেতনের চাকুরির জন্য 'Honoured Sir, 'Respected Sir,' 'Your Honour,' প্রভৃতি আত্মসম্মানহানিকর বাক্যসকল দরখাস্তে ও কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করে। চাকুরির জন্য বাঙ্গালী আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইয়াছে। শিক্ষিতেরাই জাতির অগ্রণী, ইহাদের জাতীয় আদর্শ কত ছোট হইয়া পড়িয়াছে তাহা সকলেরই ভাবিবার বিষয়। পড়াশুনা করিলাম, বড় ডিগ্রি লইলাম, পরে একটা চাকুরি, বড় জোর একটা ডেপুটীগিরি বা মুন্সেফি; কিন্তু আয়হিসাবে ডেপুটীগিরি বা মুন্সেফি কি? মুরগী-

হাটার একটা ছোট দোকানদারের আয়ও ইহাপেক্ষা বেশী। আর ছোট ব্যবসাদার হইতেই বড় ব্যবসাদার হওয়া যায়, কারণ তাহাদের পথ অবারিত।

বহুদিন পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন স্থানে গিয়াছিলাম। উপস্থিত এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক জজ তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন; তিনি কহিলেন যে সেখানে বহু বাঙ্গালী রেলের কাজ বা কেরাণীগিরি করে, তাহারা সময় কাটায় তাস ইত্যাদি খেলিয়া, থিয়েটার করিয়া এবং এই সমস্ত নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত অনেকে মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক দোষে রত থাকিয়া এবং সর্ব্বোপরি নিজেদের মধ্যে দলাদলি করিয়া। মাসকাবারে মাহিনা পায়, কোনওরূপে দিনের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া দিলেই খালাস, আত্মোন্নতির চিন্তাটাও আসে না। তাহার পর কার্য্যোপলক্ষে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি; বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে গেলেও তাহাদের এই দলাদলির ভাব প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসাদারদের বাঙ্গালী অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও এইরূপ দলাদলি নাই বলিলেও চলে। কারণ তাহাদের একটা চিন্তার বিষয় আছে।

চাকুরির বাঁধা মাহিনা, মাসের শেষে বেতন পাইবার নিশ্চয়তা চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর আত্মচেষ্টা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিতেছে। একটা বাঁধা মাহিনা হইলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, ভাবে খাইবার পরিবার ভাবনা হইতে উদ্ধার পাইল। ব্যবসাদারদের নানা দিকে নজর রাখিয়া, নানা পথে শক্তির চালনা করিয়া ব্যবসা বৃদ্ধির এবং আয় বৃদ্ধির সতত একটা চেষ্টা থাকে। এই চেষ্টাশক্তির চালনা হেতু ইহার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, ব্যবসারও উন্নতি হয়। কিন্তু চাকুরিজীবীর পয়সা যেন অনেকটা চেষ্টা না করিয়াই আসে। দিনের

পর দিন কাজ করিয়া যাও। কাজের সহিত পয়সার কোন চিন্তা বা সম্বন্ধ নাই, ব্যবসার সহিত পয়সার যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ব্যবসা ভাল না চলিলেই পয়সা কম আসিবে, চাকুরির সহিত পয়সার সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। চাকুরির পয়সা যেন অনায়াসলভ্য। এই অনায়াসলভ্য পয়সা আমরা অনায়াসেই, অর্থাৎ বৃথা বাবুগিরিতে খরচ করি। বোম্বাই প্রদেশের স্যর উপাধিধারী বড় বড় ব্যবসাদার বাঙ্গালীর পক্ষে যে-কাপড় ময়লা, সেই কাপড়ের উপর জামা পাগড়ী ও সাদা চাদর ব্যবহার করিয়া লাটের দরবার পর্য্যন্তও গমন করেন।

পয়সা রোজগার সম্বন্ধে এই যে আয়াস ভাব ইহা বাঙ্গালীর যৌথ-কারবার করিবার অক্ষমতার অন্যতম কারণ বলিয়াই বোধ হয়। বহু জনের নিকট হইতে অংশবিক্রয়লব্ধ পয়সা অনায়াসেই আত্মসাৎ করি, বা লাভ লোকসান বিবেচনা না করিয়াই খরচ করি। ওকালতি, ডাক্তারিতেও সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকটা সেইরূপ আয়াসের ভাব দেখা যায়।

বাঙ্গালীর চাকুরিপ্রিয়তার এক ফল বিবাহে পণপ্রথা। পণপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য কত সভা সমিতিতে বক্তৃতা হইয়াছে; প্রতিকার কিছুই হয় নাই। এভাবে হইবার নয়। সকল পিতা-মাতারই স্বাভাবিক ইচ্ছা যে কন্যা উপার্জ্জনক্ষম পাত্রে পড়ে। বাঙ্গালীর উপার্জ্জন মানে চাকুরি। যে ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াছে বা শিখিতেছে, পাশ করিয়াছে, তাহারই চাকুরির সম্ভাবনা বেশী। অতএব কন্যার পিতারা এরূপ ছেলেকে জামাতা করিবার প্রয়াসী হন। যে ছেলের চাহিদা বেশী তাহার দাম, আর্থাৎ পণও বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে বরের পিতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পণ প্রদানক্ষম ব্যক্তির কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষ দেওয়া যায় না। পণপ্রথার সমাধান

হইবে তখন যখন পাশ না করিয়াও অনেক ছেলে উপার্জ্জনক্ষম হইবে। তাহার পূর্ব্বে নয়।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধেরও এক প্রধান কারণ এই চাকুরি বা চাকুরির ভাগ-বাটোয়ারা। অনেক সময় দেখা যায় ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ উচ্চবেতনের চাকুরি করিতেছে; পয়সা যখন সচ্ছল তখন কেমন উদারভাব; আত্মীয়গণকে, এমন কি অপরকেও সাহায্য করিতে দ্বিধা নাই। তারপর বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন লইয়া যখন বাড়ীতে আসিয়া বসে তখন পয়সার সচ্ছলতা কম হইলে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত জায়গার ভাগ লইয়া ভাইদের সহিত কলহ ও মোকদ্দমা করিতে প্রস্তুত।

চাকুরপ্রিয়তাই বাঙ্গালীকে দরিদ্র করিয়াছে। আর এই দারিদ্র্যের দরুণ আমাদের মন ক্ষুদ্র হইয়াছে। অভাবে পড়িয়া অনেক সময় আমরা অন্ধ হইয়া যাই। যেখানে সুবিধা এবং যেমন করিয়া হউক দু-পয়সা আয় ও সঞ্চয় করিতে পারিলেই হইল। ইহার জন্য হিতাহিত জ্ঞান হারাই এবং অনেক সময় অপরের এবং দেশের পর্য্যন্ত ক্ষতি করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ করি। আর মাত্র হাজার কতক টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলেই মনে করি যে একটা হইয়া গিয়াছি। যিনি লক্ষ টাকা করিয়াছেন তাঁহার ত কথাই নাই। কিন্তু এক লক্ষ দুই লক্ষ টাকা আবার একটা টাকা!

ব্যবসা

চাকুরির চরম হইয়াছে। এখন ব্যবসা ও শিল্পের দিকে গতি ছাড়া উপায় নাই। আজকাল অনেক বাঙ্গালীর ছেলের ব্যবসার দিকে ঝোঁক হইয়াছে। ইহা আশার কথা। কিন্তু ব্যবসা করিব বলিলেই ব্যবসা করা

হয় না ; ইহার জন্য শিক্ষানবিশী করা আবশ্যক। বাঙ্গালীদের নিজেদের বড় বড় ব্যবসা নাই যে, কোথাও বড় কারবারের শিক্ষানবিশী করিবে। যৌথ-কারবারে ব্যবসা করিবার মত শিক্ষা এখনও পায় নাই। তাহাদিগকে ব্যবসার অ, আ, হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। যাঁহারা বড় বড় ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন করুন, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র শিক্ষানবিশী হইতেছে ছোট ছোট ব্যবসা।

মাড়োয়ারী, দিল্লীওয়ালা, গুজরাটী, সুরাট, ভাটিয়া, বা পার্শী, যাহারা এখন ব্যবসায়ে কৃতী ও ধনী, এমন কোন ঈশ্বরদত্ত বিশেষ ক্ষমতা লইয়া জন্মে নাই কেবল যাহা দ্বারাই ইহারা ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ে কৃতিত্ব কেবলমাত্র শিক্ষা ও চেষ্টার ফল। ঐ দিকে শিক্ষা ও মতি হইলে বাঙ্গালীও বড় ব্যবসাদার হইবে। এখনও চাকুরিপ্রীতির দিনেও বাঙ্গালী ব্যবসাদার নাই এমন নয়। ব্যবসাতে উন্নতির পথ অবারিত, ছোট ছোট ব্যবসাদারদেরও সময় সময় এমন সুযোগ আসিয়া পড়ে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই বহু উন্নতি করিতে পারে। লাভলোকসান বুঝিয়া সততার সহিত ছোট ছোট ব্যবসা করিতে শিখিলেই ধাপে ধাপে উঠিয়া বড় হইবেই ; কিন্তু এক বিশেষ সর্ত্ত হইতেছে এই যে, নিজে হাতেকলমে কাজ করিতে হইবে। আয় হইতে ব্যয়াধিক্য না হয় ইহার জন্য যাহা-কিছু ত্যাগ করিতে হয় তাহা করিতে হইবে। ব্যবসার শিক্ষানবিশীতে বাবুগিরির স্থান নাই। এক জেলার এক প্রবীণ উকীল তাঁহার পাশ-করা পুত্র ও আত্মীয়গণকে এক কারবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। টেবিল, চেয়ার, টেলিফোনের সমস্ত বন্দোবস্ত হইল ; কিন্তু বৎসরান্তেই লালবাতি জ্বালাইতে হইল। অথচ সেই একইরূপ ব্যবসায়ে একজন নয়,

কয়েকজন মাড়োয়ারী লক্ষপতি হইল। এবং তাহাদের ব্যবসা যেন চিরস্থায়ী; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাহারা ভোগ দখল করিবে।

সামান্য ব্যবসা আরম্ভ করিয়া কিরূপে উন্নতি হয় তাহার দৃষ্টান্ত দুই একটি দিতেছি—এক হিন্দুস্থানী বর্ম্মা রেলে খালাসীর কাজ করিত, কেরাসিন তেল ইত্যাদি প্রতি ষ্টেশনে বিলি করিয়া বেড়াইত। ভুলক্রমে কোন ষ্টেশনে বেশী দেওয়ার দরুণ হিসাবে গরমিল হয় এবং তাহার চাকুরি যায়। তখন সে আর চাকুরির চেষ্টা না করিয়া আমার এক বন্ধুর নিকট সামান্য মাত্র টাকা লইয়া উত্তর-বর্ম্মার এক শহর হইতে গুড় কিনিয়া রেঙ্গুনে বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিল। এইরূপে কেনা-বেচা করিতে লাগিল। ঐ বন্ধুর টাকা সময় মত শোধ দিত এবং দরকার হইলে লইত। কয়েকবৎসর তাহার আর কোন খবর পাওয়া গেল না। পরে হঠাৎ একদিন আসিয়া আমার বন্ধুকে বলিল যে, একবার তাহার দোকানে পদার্পণ করিলে সে কৃতার্থ হইবে। তখন তাহার দোকানে প্রায় দশ-বার হাজার টাকার মাল মজুত এবং সে ছোট-খাট একটি ব্যবসাদার।

কলিকাতার এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার এণ্ট্রান্স ফেল-করা একপুত্রের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কোন চাকরি জোগাড় করিতে পারিলেন না; এমন কি ২৫০্ টাকা ঘুষ দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। যখন কোন চাকরি হইল না তখন এই ২৫০্ টাকা পুত্রকে দিয়া বলিলেন, "তুমি এই টাকা লইয়া কিছু করিতে পার কি না দেখ।"

পুত্রের সুমতি হইল, সে এক মনোহারী দোকানের পত্তন করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই বেশ সঙ্গতিপন্ন হইল।

কলিকাতার চাঁদনীর নীলমণি দত্তের কাটা-কাপড়ের দোকান

অনেকেই জানেন। ফিরিঙ্গী-মহল নীলমণি দত্তের দোকানের পোষাক হইলেই চরম হইল বলিয়া মনে করে। এই নীলমণি দত্তের পিতা সামান্য পকোড়া বা পক্কড় বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতেন। এইজন্য তালতলায়, যেখানে ইহাদের বাস, নীলমণি দত্তের চলিত নাম "নীলুফক্কড়" (নীলুপক্কড়)। নীলমণি এক বাঙ্গালীর কাটা-কাপড়ের দোকানে দুই টাকা বেতনে চাকররূপে নিযুক্ত হন। তামাক সাজিতেন, দোকান ঝাঁট দিতেন। নীলমণির বুদ্ধি ও সততা ছিল এবং ক্রমে দোকানের কাজ বুঝিতে পারিলেন। ঐ দোকানের মালিকের মৃত্যু হইলে নীলমণি দোকান চালাইতে থাকেন, পরে অংশীদার হন, এবং আরও পরে নিজেই দোকান করেন। তালতলায় নীলমণি দত্তের এখন এত বাড়ী যে বাড়ী ভাড়ার আয় মাসে দশ-বার হাজার টাকা। তাঁহার বাড়ীর ভাড়া কম এবং কেহ ভাড়া দিতে না পারিলে কাহারও উপর নালিশ করিতেন না। অন্য বাড়ী দেখিয়া তাহাকে তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। কেহ কেহ এক বৎসর দেড় বৎসর বিনা ভাড়ায় থাকিয়া গিয়াছে। নীলমণি দত্তের এত পয়সা হইলেও বরাবর সাদাসিধা ভাব ছিল এবং লোকের সহিত অতি অমায়িক ব্যবহার করিতেন। বিশেষ করিয়া কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যদি কেহ খোঁজ করেন, কত নীলমণি দত্ত দেখিতে পাইবেন। কেহ হয়ত চাকর, না হয় সরকার হইয়া কোন দোকানে কাজ করিতে করিতে নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন; এখন তাঁহাদের বাড়ীতে হয়ত দুর্গোৎসবে হাজার হাজার, এমন কি, লক্ষ টাকাও খরচ হয়। প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী এন্, সি, সরকার সামান্য বেতনে কেরাণী-রূপে জীবন আরম্ভ করেন। (তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা লিখিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে এখন ইহার ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে)। আর এক কয়লার ব্যবসাদারকে

জানি, যিনি রাঁধুনী হইয়া গিয়াছিলেন; ইঁহার বাড়ীতে এখন দুর্গোৎসবে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়, একটা বাঙ্গালীর ছেলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া অসঙ্গতি হেতু পড়া ছাড়িয়া সামান্য বেতনে এক কয়লার মালিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, পাঁচ সাত বৎসর যাইতে না-যাইতে ২৫০৲ টাকা বেতনে এক গদির ম্যানেজার হয় এবং এখন নিজের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। হয় ত কালে সে দ্বিতীয় এন্, সি, সরকার হইবে। বুঝিয়া ব্যবসা করিতে পারিলে ছোট ছোট ব্যবসাই ক্রমে কিরূপে বড় হয় তাহার এইরূপ কত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পয়সা সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে। কুড়াইয়া লইতে জানা চাই। ইহার জন্য শিক্ষা-নবিশীর প্রয়োজন। বি-এ পাশ করিয়া পুত্রকন্যার জনকরূপে এরূপ শিক্ষানবিশী হয় না।

ব্রহ্মদেশে প্রায় সব বাঙ্গালীই চাকুরি করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র বাঙ্গালী ব্যবসাদার ৺শশীভূষণ নিয়োগী। অতি সামান্য দোকান হইতে ক্রমে বড় ব্যবসাদার এবং বহু লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছিলেন। হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। পয়সা হইলেও অমায়িকতা কখনও হারান নাই। সম্প্রতি তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে, কিন্তু তিনি বঙ্গ সন্তানের সম্মুখে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার স্বনামধন্য স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছোট হইতে কত বড় হইয়াছেন তাহা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কলিকাতার স্বনামধন্য ৺বটকৃষ্ণ পাল দাঁ কোম্পানীর ঔষধের দোকানে সামান্য কর্ম্মে জীবন আরম্ভ করেন! শুনিয়াছি তিনি নিজের কর্ম্ম-জীবনের প্রথম সময়ের পরিচয় দিবার সময় কেমন করিয়া ভাত খাইয়া নিজেরাই শকড়ী উঠাইতেন তাহা বলিতেন, বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর বৃহৎ কারবার বাঙ্গালার সম্মুখে এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাঁহার

বংশধরেরা দেশের নানাবিধ হিতকর কার্য্যে সাহায্য করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন। শিল্প ও ব্যবসা দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিতে সক্ষম নহে বলিয়াই পার্শী, মাড়োয়ারী প্রভৃতির ন্যায় বাঙ্গালী জনহিতকর কার্য্যে তেমন অর্থসাহায্য করিতে পারে না। পার্শীরা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য কত বৃত্তি, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে; তাহারা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী নয়।

ব্যবসা ও শিল্পে শিক্ষানবিশী

চেট্টি সম্প্রদায়

মান্দ্রাজে চেট্টি নামে এক সম্প্রদায় আছেন। ইঁহাদের ব্যবসা মহাজনী। দক্ষিণ ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, যাভা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে ইঁহারা মহাজনী কারবার করেন। ইঁহাদের সংখ্যা মোট প্রায় তিন লক্ষ, কিন্তু ইঁহারা গবর্ণমেণ্টকে কেবল ব্রহ্মদেশেই চল্লিশ লক্ষ টাকা আয়-কর দেন। ইঁহাদের মধ্যে স্যর (এখন রাজা) আনামেলাই চেট্টি প্রভৃতি ধনীদের গৃহে মান্দ্রাজের লাটসাহেব আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই, এমন কি অনেক পল্লীতে, চেট্টির্ দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। দোকানে একজন এজেণ্ট, এবং এজেণ্টের অধীন কেরাণী, রাঁধুনী ও চাকর থাকে। সকলেই মান্দ্রাজ প্রদেশীয়। সকলেরই খাওয়া একত্রে হয়; খাওয়ার খরচ দোকানের। খাওয়া ছাড়া কর্ম্মচারিদিগকে বেতন দেওয়া হয়। এজেণ্ট তিন বৎসরের জন্য নিয়োজিত হন। খাওয়া, থাকিবার বাড়ী, এবং দরকার হইলে গাড়ী বা মোটর গাড়ী পান এবং দোকানের কারবারের অনুপাতে বেতন পান। ছোট ছোট দোকানের এজেণ্টের বেতন তিন বৎসরে পাঁচ ছয় হাজার টাকা। রেঙ্গুনের এক বড় দোকানের এজেণ্টের বেতন ত্রিশ হাজার

টাকা। এই বেতনের অর্দ্ধেক নিয়োজিত হইবার সময় এবং বাকী অর্দ্ধেক তিন বৎসরের শেষে পান। ইহা ছাড়া কমিশন পান। কমিশনের পরিমাণ লাভ অনুসারে হয়। রেঙ্গুনের যে বড় দোকানের কথা বলিলাম তাহার এজেণ্টের কমিশন তিন বৎসরে ষাট-সত্তর হাজার টাকা, কখনও কখনও লক্ষ টাকাও হইতে পারে। ইহা ছাড়া ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর কাজ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন্-স্বরূপ দশ-পনর, কি, বিশ হাজার টাকা পান।

মান্দালয়ের এক দোকানের এজেণ্টের পরিচয় দিতেছি। ইঁহার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর; ইনি ইংরেজী জানেন না। ইঁহার বেতন তিন বৎসরে বিশ হাজার টাকা, থাকিবার বাড়ী ও গাড়ী পাইয়াছেন। হিন্দুস্থানী সহিস্ কোচ্ম্যান্ দরোয়ান ব্যতীত দোকানে নিয়োজিত আরও চব্বিশ জন লোক মান্দ্রাজ প্রদেশীয়। ইঁহাদের সকলেরই খাওয়া দোকানের খরচে একত্রে হয়; খাওয়ার জন্য মাসে প্রায় সাড়ে তিনশত টাকা ব্যয় হয়। এই দোকানের বাড়ী নিজস্ব এবং পঁচাত্তর হাজার টাকায় কেনা হইয়াছে। এজেণ্ট মহাশয় আর মাস কয়েক কাজ করিয়া তিন বৎসর পূর্ণ হইলে পেন্সন্ লইবেন। ইনি পনর বৎসর বয়সে এক দোকানে চাকর হইয়া আসেন। দুই বৎসর বিনা বেতনে কাজ করিবার পর পনর টাকা বেতন হয়। ক্রমে চাকর হইতে কেরাণী, কেরাণী হইতে ছোট দোকানের এজেণ্ট এবং ক্রমে বড় দোকানের এজেণ্ট হন। ইনি নিজে এখন ছয়-সাত লক্ষ টাকার মালিক। এবং নিজে হেন্জাদা জেলায় দুইটি দোকান খুলিয়াছেন। এক দোকানের এজেণ্টকে তিন বৎসরে ছয় হাজার এবং অপর দোকানের এজেণ্টকে আট হাজার টাকা বেতন দেন। ইঁহার দুই পুত্র। দুই জনেই অপর দোকানে চাকররূপে

নিযুক্ত আছে। নিজে এত টাকার মালিক এবং নিজের দোকানে অপর লোককে নিযুক্ত করিয়া পুত্রদিগকে পরের দোকানে চাকররূপে রাখিয়া দিয়াছেন কেন জিজ্ঞাসা করায় বলেন যে, এইরূপ না করিলে, কাজ শিখিবে না, বাবু হইয়া যাইবে, বড়মানুষী চাল শিখিবে। ইনি নিজে পিতার নিকট হইতে প্রায় একলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। ইঁহার পিতাও নির্ধন ছিলেন না। ব্যবসার জন্য শিক্ষানবিশীর মূল্য কিরূপ ইঁহারা বুঝেন। তাহা এই উদাহরণ হইতে প্রমাণিত হয়। এই এজেণ্ট মহাশয়ের সহিত একদিন রেলগাড়ীতে যাইতেছিলাম, কার্য্যোপলক্ষে আমাকে প্রথম শ্রেণীতেই যাইতে হয়। লাইন ভাঙার দরুণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান না পাওয়ায় তিনিও প্রথম শ্রেণীতে যাইতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া পরিচয় দিলেন। পনর-বিশ বৎসর পূর্ব্বে সকল চেট্টিই তৃতীয় শ্রেণীতে চড়িত। এখন সঙ্গতিপন্ন চেট্টিরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়ে। বর্ম্মা রেলে মধ্যম শ্রেণী নাই। আরও পরিচয় দিলেন যে, পূর্ব্বে চেট্টিরা রোজগারের টাকা-প্রতি দুই আনা খরচ করিত; এখন সভ্যতার তাড়নায় কেহ কেহ টাকা-প্রতি আট আনাও খরচ করে। ইঁহার পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা পিরান এবং সাদা চাদর, পায়ে চটী জুতা। সঙ্গে এক চাকর ছিল; বিছানা করিয়া দিয়া গেল; খাওয়া হইলে পাত্র পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া রাখিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, একদিন এই চাকরও তাঁহার মত চেট্টি হইতে পারে এবং খুব সম্ভব হইবেও। ইঁহার দোকানের মালিক রাজা স্যর আনামেলাই চেট্টি। ইনি ক্রোরপতি। মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ এবং সিঙ্গাপুর অঞ্চলে ইঁহার অনেক দোকান আছে। ইঁহার পুত্র বি-এ পাশ করিবার পর মান্দ্রাজে নিজেরই এক দোকানে এক বৎসর কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন, তাহার পর রেঙ্গুনের এক দোকানে এক বৎসর কেরাণীগিরি করিয়া সম্প্রতি

মাদ্রাজে ফিরিয়া গিয়াছেন। ফিরিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের সমস্ত দোকান দেখিয়া গিয়াছেন। বাড়ীতে এক বৎসর থাকিয়া সিঙ্গাপুর গিয়া আর এক বৎসর কেরাণীগিরি করিবেন। কেরাণীগিরি করিবার সময় এজেণ্টের অধীনে অপরাপর কেরাণীর মতই থাকেন।

চেট্টিরা কখনও পরিবার লইয়া বিদেশে থাকেন না ; স্ত্রী-কন্যাগণকে বিদেশে আনেন না। তিন বৎসর কাজের পর দেশে যান ও দেশে এক বৎসর থাকিয়া পুনরায় বিদেশে যান। চেট্টির দোকানে যে-কোন চেট্টি যাইয়া যতদিন ইচ্ছা থাকিতে ও খাইতে পায়। মেমিও শহরে একটিমাত্র চেট্টির দোকান আছে। মেমিও ব্রহ্মদেশের দার্জ্জিলিং। সকল স্থান হইতেই লোক এখানে আসে। আগন্তুক চেট্টিদের খাওয়ার জন্য মেমিওর এই দোকানের মাসে প্রায় চারিশত টাকা খরচ হয়। পৃথক রাঁধুনী ও চাকরের বন্দোবস্ত আছে।

চেট্টির দোকানে চেট্টি ব্যতীত পিলে প্রভৃতি অপর জাতীয় লোকও চাকর কেরাণীরূপে নিযুক্ত হয়। কিন্তু চেট্টি ব্যতীত কাহাকেও এজেণ্ট করা হয় না। পিলে প্রভৃতি অপর জাতীয় কেরাণী অনেক সময় নিজে দোকান খুলিয়া বসে।

চেট্টিদের কারবার সম্পূর্ণরূপে সততার উপর স্থাপিত। সকল চেট্টিই টাকা জমা রাখেন ; ব্যাঙ্কিং কারবার করেন। পোষ্টাফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মত একটি পুস্তকে জমা দেওয়া বা উঠাইয়া লওয়া টাকার হিসাব থাকে। অনেকের লক্ষ লক্ষ টাকা চেট্টিদের নিকট জমা আছে। এইরূপ গচ্ছিত টাকার জন্য সেভিংস্ ব্যাঙ্ক অপেক্ষা উচ্চহারে সুদ পাওয়া যায়। যাঁহারা ইহাদের সহিত কারবার করেন তাঁহারা নিজেদের গহনা হীরা জহরতের বাক্স চেট্টিদের দোকানে চোর ডাকাতের ভয়ে গচ্ছিত রাখেন। এইরূপে গচ্ছিত বাক্সের জন্য চেট্টিরা

কখনও রসিদ দেন না, কিন্তু কখনও কোন বাক্স হারাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

ব্রহ্মদেশের চেট্টিরাই ছোট-বড় ব্যবসায়ে মূলধন জোগাইয়া থাকেন। জমি, বাড়ী, গহনাপত্র এবং কলকারখানা বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার দিয়া থাকেন। সেইজন্য অনেক জমি, বহু বাড়ী এবং কলকারখানাও এখন চেট্টিদের হাতে পড়িয়াছে।

সিন্ধি ব্যবসাদার

চেট্টি সম্প্রদায়ের মত সিন্ধি ব্যবসাদারদেরও কিছু পরিচয় দিতেছি। বিদেশে ভ্রমণের সময় ইঁহাদের কথা জানিতে পারি। রেঙ্গুন হইতে যে জাহাজে আমি জাপান যাই সেই জাহাজে আমারই কেবিনে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন সিন্ধি ব্যবসাদার শ্রীযুক্ত হ্ব্যান্দা মল। সিঙ্গাপুরে ইনি প্রথম দোকান খুলিয়াছেন এবং এই দোকানের চাকররূপে কাজ করিবার জন্য দেশ হইতে সাত-আট জন সিন্ধি যুবককে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। দক্ষিণ আমেরিকার বুয়ানেস্ আয়ার্স শহরে এক সিন্ধির দোকানে ইনি চাকররূপে প্রথমে জীবন আরম্ভ করেন। দোকানের মাল তিনি শহরে ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতেন। তারপর নানাদেশে সিন্ধিদের দোকানে কাজ করিয়াছেন। নিজে সিঙ্গাপুরে দোকান খুলিবার পূর্ব্বে জাপানের ইয়োকোহামা শহরে এক দোকানের ম্যানেজার ছিলেন। সিঙ্গাপুরের দোকানে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। দোকানে মালের মূল্য কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হইতে লক্ষটাকা হইবে। দোকানের উপরেই নিজেদের এবং বারজন চাকরের থাকিবার স্থান। চাকরেরাই রান্না ইত্যাদি সমস্ত কাজ করে এবং দোকানের

কেনা-বেচাও করে। সকলেই কোট পেণ্টলুন পরে এবং কাজ-চালান-গোছ ইংরেজি বলিতে পারে। মালিকের থাকিবার ঘরের আসবাবপত্র সুন্দর এবং তিনি এমন সুন্দর পোষাকপরিচ্ছদ পরেন যে, বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটিও সেরূপ পরেন না বা পরিতে পারেন না।

পৃথিবীর দূর দূর দেশে বড় বড় শহরে যেখানে সুবিধা পাইয়াছে এই সিন্ধি ব্যবসাদারেরা গিয়া দোকান খুলিয়াছে। এই সকল দোকানে গালিচা, আসন, কার্পেট, মোরদাবাদের কাজ করা কাঁসা পিতলের জিনিষ, পাথরের জিনিষ, গালার জিনিষ, গহনা, রেশমী বস্ত্র, জামা পোযাক প্রভৃতি বিক্রয় হয়। পোষাক তৈয়ারী ও সেলাইয়ের কাজও হয়। মালিক নিজেই দোকান পরিচালনা করেন। নানা দেশে একের অধিক দোকান থাকিলে ম্যানেজার রাখিতে হয়। দোকানের চাকর কেরাণী ম্যানেজার সকলেই সিন্ধি। ইহারাও চেট্টিদের মত বিদেশে পরিবার লইয়া যান না। এখন কেহ কেহ স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জাপানের ইয়োকোহামা শহর হইতে আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহর পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের উপর জাহাজেও একজন সিন্ধি ব্যবসায়ী আমার সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতার ঈজিপ্টে দোকান ছিল। এই দোকানে তিনি চাকর ও পরে কেরাণীরূপে জীবন আরম্ভ করেন। ইহার জাপানের ইয়োকোহামা শহরে এবং পাশমা কেনালেও দোকান আছে। ইনি তখন ইয়োকোহামার দোকান হইতে পাশমা কেনালের দোকানে যাইতেছিলেন। ইনি সঙ্গে থাকায় হনোলুলু শহরের দুইটি সিন্ধির দোকান দেখিবার আমার সুবিধা হইয়াছিল। ইঁহাদের একজনের বাড়ীতেও গিয়াছিলাম। এই বাড়ী আমেরিকার

ধনীদের বাড়ীগুলির মধ্যে। ইনি নিজের মোটরে আমাদিগকে হনোলুলু শহর দেখাইয়াছিলেন। মাড়োয়ারী, খোজা প্রভৃতি ভারতবর্ষের যাঁহারা এখন ব্যবসায়ে উন্নত তাঁহাদের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষার দিকে ঝোঁক না দিয়া অল্প বয়স হইতেই ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করে। এই মান্দালয় শহরে এক খোজা ব্যবসায়ীর কথা জানি, যাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা। তাঁহার পুত্র চাকরদিগেরই মত দোকানে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া এবং এমন কি, দোকান ঝাঁট দিয়া কাজ শিখে এবং পরে সক্ষম হইলে তবে গদিতে বসে। ইহারা ইংরেজীর বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত দরকার বলিয়া বিবেচনা করে না।

ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশীর কিরূপ প্রযোজন তাহা বোধ হয় এখন বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। বাঙ্গালীর ছেলের এখন প্রয়োজন হইয়াছে চলনসই লেখাপড়া শিখিয়া এই শিক্ষানবিশী অবলম্বন করা। ইহাতে কোনরূপ পাশের দরকার নাই।

বাঙ্গালী যুবকদের বুদ্ধি ও সামর্থ্যের উপর আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। ঠিক পথে চলিলে তাহারা সব কাজই করিতে সক্ষম। দু-দিনের আর্থিক দুরবস্থাতে হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। ঠিক পথে চেষ্টা করিলে অল্প দিনেই সময় ফিরিয়া আসিবে। কবে এবং কখন তাহা আমাদেরই উপর নির্ভর করে।

ব্যবসা সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষানবিশী প্রয়োজন, শিল্প সম্বন্ধেও তাহাই; বরঞ্চ বেশী। অনেক শিল্প বংশগত। আধুনিক যন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অনেক শিল্পই বংশগত ছিল। বিলাত আমেরিকায় mechanical engineering প্রভৃতির জন্য পনের-ষোল বৎসর বয়স হইতেই শিক্ষানবিশী আরম্ভ হয়। সাত-আট-দশ বৎসর শিক্ষানবিশীর পর

ইহারাই বড় বড় শিল্পের অধিনায়ক হয়। ইহার জন্যও পাশের দরকার নাই; তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ শিক্ষা আমাদের মত পুঁথিগত এবং সাহিত্য-গন্ধ না হইয়া কার্য্যকরী হওয়া দরকার।

ইংলণ্ডের ন্যায় শিল্পে উন্নত ও অগ্রসর দেশে নানাবিধ শিল্পে যে-সকল যন্ত্রী বা ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক হয় তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য সম্প্রতি এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটির রিপোর্টে * প্রকাশ যে, এই সকল ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে শতকরা নব্বই জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়াই চৌদ্দ বৎসর বয়সে কারখানাতে শিক্ষানবিশরূপে শিক্ষা আরম্ভ করে। বাকি দশ জনের মধ্যে বেশীর ভাগই জুনিয়র টেকনিকাল স্কুল হইতে পনের-ষোল বৎসর বয়সে এবং অল্প সংখ্যক মধ্য শ্রেণীর স্কুল হইতে ষোল-সতের বৎসর বয়সে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশ্রেণীর টেকনিকাল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা নগণ্য।

জাপানেও দেখিয়াছি ব্যবসায়ে, দোকানে এবং শিল্পশালায় লোক নিযুক্ত করিবার সময় প্রায় সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়াছে এইরূপ চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরকেই পছন্দ করে। তাহারা বলে এইরূপ কিশোরকে নিজের মত করিয়া গড়িয়া তোলা সহজ হয়। জাপান যখন নূতন নূতন শিল্প আরম্ভ করিল সর্ব্বত্র টেকনিকাল স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষানবিশীর জন্য কারখানার অভাব পূরণ করিল। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়াই এই সকল টেকনিকাল

* Education for the Engineering Industry: 1. Report of the Committee on Education for the Engineering, Industry. 2. Comment on the Report by Education Bodies, London, H. M. Stationery Office, 1931; 1s. 3d. net.

স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া যায়। শিক্ষা জাপানী ভাষার ভিতর দিয়াই হয় এবং পুস্তকাদিও জাপানী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রায় বৎসরখানেক হইল ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ব্রহ্মদেশবাসী কোন সভ্য বর্ম্মা ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য এক টেকনিকাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই বলিয়া আপত্তি উঠিল যে, বর্ম্মা ভাষায় বই নাই এবং টেকনিকাল জ্ঞান প্রকাশের জন্য অনুরূপ অনেক শব্দই নাই। এই আপত্তিতেই প্রস্তাবটি পণ্ড হইয়া গেল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই ধারণা। এবং তাহা যে নিছক কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন জাপানের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। দেশবাসীরা চেষ্টা করিলেই বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা এবং বাঙ্গালা ভাষাতেই টেকনিকাল-বিষয়সকল শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইতে বেশী দেরী হইবে না।

শিল্প

শিল্প কি ? খাদ্য ছাড়া মানুষের আরও অনেক জিনিষ প্রয়োজন হয়, যথা—পরিধেয় বস্ত্র, বাসন, কৃষির যন্ত্রপাতি :—লাঙ্গল, কোদাল কুড়ুল, কাটারি, কাস্তে ইত্যাদি, ছাতা, জুতা, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, সুতা, দোয়াত, কাগজ, কলম, পেন্সিল্ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করার নাম শিল্প। গাড়ী, রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, জাহাজ নির্ম্মাণও শিল্প। খাদ্যের পর সকল মানুষেরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে বস্ত্র। বস্ত্র বয়নই সকল শিল্পের প্রধান। চারি প্রকার দ্রব্য হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম—কার্পাস, দ্বিতীয়—রেশম, তৃতীয়—উল এবং চতুর্থ—রেয়ন্। ইহার সকলগুলিই হইল বস্ত্রের কাঁচা মাল। রেশম রেশমকীট হইতে উৎপন্ন হয়। উল পশুর লোম। রেয়ন্ কার্পাসের মত উদ্ভিজ্জ। কাঠকে (বেশীর ভাগই পাইন বা দেবদারু কাঠ) ঔষধসাহায্যে

গলাইয়া সেই তরল পদার্থকে মিহি সুতার আকারে টানিয়া বাহির করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া শক্ত হইলেই যে সুতা হয় তাহার নাম রেয়ন্। ইহা রেশমের ন্যায় দেখায় বলিয়া ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল artificial silk বা মেকি রেশম। যে দেশ এই চারি প্রকার বস্ত্রের বা কোন একটির প্রচুর উৎপন্ন দ্বারা নানা দেশের সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছে সেই দেশই প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালার পূর্ব্বসম্পদ প্রধানতঃ বয়নশিল্প হইতেই গঠিত ছিল। ইংলণ্ডের প্রধান সম্পদ সুতার, রেশমের, উলের এবং রেয়নের বয়ন শিল্প হইতে। জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইতালীই প্রধানতঃ বয়নশিল্প দ্বারাই বেশীর ভাগ অর্থ উপার্জ্জন করে। পৃথিবীতে যত রেশম সুতা উৎপন্ন হয় আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাহার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর কিনিয়া লয় এবং নিজেই বস্ত্র বয়ন করিয়া ব্যবহার করে। এই বয়নশিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য রেশম সুতা বিনা মাশুলে আমদানী করে কিন্তু রেশম বস্ত্রের উপর শত-করা ৬০ মুদ্রা পর্য্যন্ত মাশুল নির্দ্ধারিত আছে। জাপান অল্প দিনের মধ্যেই সুতার কাপড় বয়নে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে। ওসাকা শহর এখন জাপানের মাঞ্চেষ্টর।* জাপানে রেশম বয়ন ও রেয়ন্ বয়ন প্রভূত পরিমাণে উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছে। এই কারণে জাপান এত শীঘ্র ধনী হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

সুতার সাধারণ বস্ত্রবয়ন এখন মিলে যত সস্তায় হয় হস্ত পরিচালিত গৃহ-তাঁতে তত হয় না। ইহার জন্য মিল্ স্থাপন আবশ্যক। কিন্তু রেশম ও রেয়ন্ বয়ন সর্ব্বত্রই গৃহ-তাঁতে হইতেছে এবং হইবেও।

* এই শহরে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীরও প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া ইহাকে জাপানের বার্হিংহামও বলা হয়।

তবে অতি উচ্চদরের এবং উচ্চমূল্যের কয়েক প্রকার রেশমী বস্ত্র ছাড়া সাধারণ রেশমী বস্ত্র আমাদের দেশের মত হাতের তাঁতে বুনিয়া প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। ইহার জন্য বৈদ্যুতিক তাঁত আবশ্যক। জাপানে ঘরে ঘরে তন্তুবায়েরা বৈদ্যুতিক তাঁত চালাইতেছে। হাতের তাঁত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। আমেরিকাতে শিক্ষিত লোকেরা কাপড় বুনিতেছে। একটি মাত্র শ্রমিক চারিটি তাঁত দেখাশুনা করিতেছে। এক খাই সুতা ছিঁড়িলেই তাঁত বন্ধ হয় এবং শ্রমিক গিয়া জোড়া দিয়া দেয়। আমাদের তন্তুবায়েরা বৈদ্যুতিক তাঁত পাইলে যে-কোন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে।

বয়নশিল্পের পরেই বোধ হয় বাসন-প্রস্তুত শিল্প। জগতের সকল জাতিই যেমন উন্নত হইয়াছে ক্রমেই কাঁসা পিত্তল প্রভৃতি ধাতুর বাসন পরিত্যাগ করিয়া চীনা মাটির বাসন গ্রহণ করিয়াছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রচলিত কাঁসা পিত্তলের বাসন লণ্ডন মিউজিয়ামে দেখিয়াছি। অসভ্য জাতিরাও চীনা মাটির বাসন শীঘ্র গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেও ধাতুর বাসন উঠিয়া যাইবে। এখন প্রায় সকল দেশেই চীনা মাটির বাসনেরই ব্যবহার। এই চীনা মাটির বাসন-প্রস্তুত শিল্পে জাপান যত উন্নতি ও বিস্তার করিয়াছে এমন আর কোন দেশ করে নাই।

সকল শিল্পেরই এইরূপ আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এমন কি দেশালাই ও খেলনাটি পর্য্যন্ত এখন কোথা হইতে আসিতেছে সকলেই লক্ষ্য করেন। শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা এখানে বলিতেছি।

প্রথম, অনেক জিনিষেরই মূল্য বেশী নয়, কিন্তু অনেক পরিমাণে কাটতি হইলেই শিল্প লাভজনক হয়। অতএব চাই বাজার।

দ্বিতীয়, আজকাল অবাধ গতিবিধির দরুণ যে-কোন দেশের উৎপন্ন দ্রব্য যে-কোন বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। সকল দেশেই নানা জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে বা উৎপন্নের চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং প্রতিযোগিতায় যে সস্তায় দিতে পারে তারই কাটৃতি বেশী। কাজেই প্রত্যেক জিনিষটি সস্তায় প্রস্তুত করিতে হইবে। কলে যত সস্তায় প্রস্তুত করিতে পারা যায় হাতে কখনই তাহা সম্ভবপর নয়। ইহা বুঝিয়াই জাপান আধুনিক কারখানা ও যন্ত্রপাতি গ্রহণ করিয়াছে এবং নূতন কিছু হইলেই গ্রহণ করে বলিয়াই এত শীঘ্র শিল্পোন্নতি করিতে পারিয়াছে।

তৃতীয়, জিনিষ যে বাজারে কাটৃতি হইবে ইহার মূলে হইতেছে সমতাসাধন, অর্থাৎ প্রত্যেক রকম জিনিষের সকলগুলিই সমান হইবে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে standardization. ক্রেতা মূল্য দিয়া একই রকম জিনিষ পাইলে সন্তুষ্ট হয়। জাপান রেশমের সুতার সমতাসাধন করিয়াছে, তাই বৎসরে সত্তর কোটি মুদ্রার সুতা বিক্রয় করে। রেশমের কাপড়ের সমতাসাধন করিয়াছে, তাই বৎসরে বিশ কোটী মুদ্রার রেশম বস্ত্র বিক্রয় করে। ছুরি কাঁচি জুতা ছাতা কাপড় লণ্ঠন প্রভৃতি সকল জিনিষেরই এইরূপ সমতা সাধিত না হইলে আমরা একই মূল্য দিয়া কিনিতে ইতস্তত করিতাম। আর কলের সাহায্যে প্রস্তুত না হইলে সমতাসাধন অসম্ভব হইত।

চতুর্থ, আধুনিক যন্ত্রপাতি গ্রহণ করিলেও এই সকল যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিবার নিপুণ কারিগর আবশ্যক। এই সকল কারিগরের বেতন অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে কম।

পঞ্চম, যন্ত্রপাতি কিনিয়া কারখানা স্থাপন এবং কাঁচা মাল কিনিয়া জিনিষ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজন—অর্থ। সকল দেশেই অতি

অল্প লোকই ব্যক্তিগত অর্থ দিয়া এইরূপ কারখানা স্থাপন করে। দশ বিশ শত টাকা করিয়া বহু লোকের নিকট সংগ্রহ করিয়াই বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠে ও চলে।

আমাদের দেশে এইরূপে মূলধন সংগ্রহ করা যায় না এমন নয়, তাছাড়া কারিগরের বেতনও অল্প। আমাদের কাঁচা মাল বিদেশীয়েরা লইয়া গিয়া জিনিষ প্রস্তুত করে এবং প্রস্তুত জিনিষ পুনরায় আমাদের দেশে পাঠাইয়া আমাদিগকে বিক্রয় করে। আমাদের কাঁচা মাল ও বাজার দরজার কাছে। আমরা চেষ্টা করিলেই শিল্পে অগ্রসর হইতে পারি। পূর্ব্বে যাহাই হউক এখন আমরা নিজের হাতে দেশের কর্ত্তৃত্ব পাইতেছি এবং শিল্প বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আইন-কানুনও করিতে পারিব। এখন আমাদের প্রয়োজন হইতেছে জ্ঞানের। ব্যবসাবাণিজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের আবশ্যক হয় না, সাধারণ শিক্ষার পর চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়স হইতে শিক্ষানবিশী করিলেই যথেষ্ট। ব্যবসা যেমন সামান্য মূলধন হইলেই যে-কেহ নিজেই আরম্ভ করিতে পারে, এক্ষেত্রে তাহা না হইলেও কর্ম্মঠ যন্ত্রী তৈয়ার হইলেই কারখানার উদ্ভব হইবে। ইহার জন্য চাই কলকারখানা সমেত নানাবিধ টেক্‌নিক্যাল স্কুল, দেশের লোকই করুক আর গবর্ণমেণ্টই করুক। কারখানার বদলে এই স্কুলগুলিই যেন প্রকৃত শিক্ষানবিশীর বন্দোবস্ত করে। এখন আমাদের টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল নামে যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে শিক্ষার বন্দোবস্ত এইরূপ যে, শিক্ষার্থীরা বাহির হইয়া চাকুরি করিবে। বোম্বাইয়ের ভিক্‌টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিক্যাল স্কুল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত। ইহাতেও কেবল চাকুরিয়া তৈরী করিবার বন্দোবস্তই আছে। জাপান, আমেরিকা ও বিলাত হইতে ফিরিবার পথে এই স্কুলে গিয়া ও দেখিয়া শুনিয়া

অধ্যক্ষের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করিয়া প্রশ্ন করিলাম, জাপানে যেমন দেখিয়াছি আপনার স্কুলে সেরূপ কোন প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনপ্রণালী কেন শিক্ষা দেওয়া হয় না যাহাতে শিক্ষার্থীরা বাহির হইয়া এই সকল বস্তু উৎপাদন দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য—মিলগুলির যন্ত্রী সরবরাহ, তাহা সাধিত হইবে না। সকল বিভাগেই কেবল যন্ত্র চালনাই শিক্ষার বিষয়।

বয়নবিভাগে শিক্ষার বিষয় প্রধানতঃ মিলের অনুযায়ী ছোট ছোট যন্ত্রে কার্পাসের পাট ও বস্ত্রবুনন। ইহার সঙ্গে তিনটি, কি চারিটি, হাতের তাঁত আছে, ইহার কাজও শিখান হয়। ইহা দ্বারা হাতের তাঁতে পারদর্শিতা কিছুই হয় না, যে-কোন তাঁতির হাতের তাঁতে পারদর্শিতা এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা অনেক বেশী। অথচ এই স্কুলের নামে ইহার ছাত্রেরা ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই হাতের তাঁতের বিশেষজ্ঞ বলিয়া নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইহাদের বেতন মাসে জাপানের মন্ত্রীদের বেতনের সমান। লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ ব্যতীত এই ব্যবস্থার আর কোন উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

শিল্পে গবেষণা ও পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারাই নূতন উন্নত প্রণালী ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। অধিকাংশ স্থলেই শিল্পশালার মালিকগণ একযোগে সমিতি গঠন করিয়া এইরূপ গবেষণা ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে এরূপ ব্যবস্থার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন একটি বৃহৎ টেক্‌নিকাল স্কুল বা কলেজ,—যেখানে আমাদের দেশে সম্ভবপর আধুনিক সকল শিল্পের মডেল যন্ত্রপাতির কার্য্য দেখান ও শিক্ষাদান হইতে

পারে। স্বচক্ষে কার্য্য দেখিলে এবং কার্য্য শিক্ষার সুবিধা হইলে লোকে তাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। পৃথিবীর যে-কোন দেশে নূতন যন্ত্রপাতি কিছু আবিষ্কৃত হইলেই অনতিবিলম্বে জাপান তাহ৷ লইয়া গিয়া পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনমত বদলাইয়া জাপানে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের সুবিধা করে। দেশময় উন্নত রেশমকাটাই যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি এইরূপে প্রচলিত হইয়াছে।

শিল্প সম্বন্ধে আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এখনও দেশে যে সকল শিল্প আছে তাহা সেকেলে ধরণে চালিত হইলেও এই সকল শিল্পীকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপায় অবলম্বন করিতে সাহায্য করিলে ফল শীঘ্র পাওয়া যাইবে। কারণ তাহাদের যে নিপুণতা আছে তাহার মূল্য কম নহে। যে-কেহ এক পাটি রেশম বা সুতার থাই বাহির করিতে চেষ্টা করিলেই এক থাইয়ের মূল্য বুঝিতে পারিবেন। সকল রকমের কলাকৌশল শিল্পীদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া তাহাদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া তাহাদের সমবায়ে ও সহযোগে প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাপকভাবে করা অসম্ভব নয়। অধুনা বহু কলাকৌশল লুপ্ত হইয়া দেশের ক্ষতি হইয়াছে, এখনও যাহা আছে তাহা একেবারে নষ্ট হইলে মহা ক্ষতি হইবে। কাজ করিতে করিতেই শিল্পীর নিপুণতা বাড়ে। নিপুণতায় অপর দেশ অগ্রসর হইলেও আমাদিগকেও তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। চেষ্টা এখনই আবশ্যক।

শিল্পে উন্নতি করিতে না পারিলে দেশ দরিদ্র থাকিবেই। একমাত্র রেশমশিল্পের দ্বারাই জাপানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক জীবিকা অর্জ্জন করে এবং ইহাই জাপানের প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাগমের উপায়। বস্ত্র বয়ন, রেল নির্ম্মাণ, জাহাজ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে কত শত সহস্র লোকের জীবিকার উপায় হয়। জাপানে ও ইংলণ্ডে টেলিগ্রামের

থামগুলি কাঠের। কিন্তু আমাদের দেশে এই সমস্তই লোহার, সেগুলি তৈয়ার করিয়াছে বিলাতের কারিগর। অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিষও আমাদের দেশে ক্রয় করা হয় বিলাতী কারিগরের কাজ জোগাইবার জন্ম। আর আমাদেরই দেশের লোক কার্য্যের অভাবে অর্দ্ধভুক্ত বা অভুক্ত থাকে!

ব্যবসায়ে ছোট হইতে কিরূপে বড় হওয়া যায় তাহার উদাহরণ দিয়াছি। আমাদের দেশে শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ উদাহরণ দিবার সন্ধান আমার জানা নাই। তবে শুনিয়াছি বোম্বাই অঞ্চলে কোন কোন কাপড়কলের মালিক মিলেরই সামান্ত কাজে জীবন আরম্ভ করিয়া শেষে নিজে বড় কল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত হেন্‌রী ফিপস্ জাতিতে ইংরেজ এবং দরিদ্র জুতা প্রস্তুত-কারক বা চর্ম্মকার-রূপে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। তিনি মৃত্যুসময়ে বিরাশি কোটি টাকা রাখিয়া যান। ইনি ভারতের কৃষির উন্নতির জন্ম লর্ড কার্জনের হাতে ছয় লক্ষ টাকা দেন এবং ইহা লইয়াই লর্ড কার্জন পুষা কৃষি কলেজ স্থাপন করেন।

প্রসিদ্ধ মোটরগাড়ী নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত হেন্‌রি ফোর্ডের কথা সকলেই জানেন। ইনি এক কৃষকের সন্তান এবং আট বৎসরকাল এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় অতি অল্প বেতনে কাজ করেন। ইনি এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী বলিয়া বিবেচিত।

সান্‌লাইট সাবান প্রভৃতির প্রস্তুতকারী এবং এখন লর্ড উপাধিধারী লর্ড লিভার্‌হুম্ ষোল বৎসর বয়সে এক দোকানে কাগজ দিয়া সাবান মুড়িবার কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রথমে সাবান প্রস্তুত করিয়া নিজেই গাড়ী হাঁকাইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিতেন।

ইংরেজ আমাদের শিল্প নষ্ট করিয়াছে বলিয়া কেবল হা হুতাশ বা আক্ষেপে কোন ফল হইবে না। যাহা হইয়াছে—হইয়াছে। ক্রোধ ও আক্ষেপ ত্যাগ করিয়া পুনরায় কিরূপে শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা এখন আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশেও বয়নশিল্প ছিল, কিন্তু এমন লোকের হাতে যাহাদের দুনিয়ার খবর রাখিবার মত শিক্ষা ছিল না এবং কাজে কাজেই তাহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। আমাদেরও রেশম উৎপাদন ও রেশম-বয়ন-শিল্প ছিল। প্রধানতঃ ঐ একই কারণে তাহাও হারাইয়াছি। ভারতবর্ষের লোকে এখন পাঁচ-ছয় কোটী টাকার রেশম সুতা ও বস্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া ব্যবহার করে। রেয়ন এখন নানা দেশে উৎপাদিত হইতেছে তাহার খবর আমরা রাখি নাই। কিন্তু এখন আমরাই বৎসরে চারি কোটী টাকার রেয়ন বস্ত্র অপর দেশ হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতেছি। এই বস্ত্র সরবরাহ করিয়া জাপান বিস্তর অর্থ আমাদের দেশ হইতে লইয়া যাইতেছে। প্রকৃত চেষ্টা হইলেই এই সমস্ত ও অপরাপর কত শিল্প আমরা গড়িয়া তুলিতে পারিব। যাহাদের সহিত আমাদিগকে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর জ্ঞান এবং আধুনিক উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি গ্রহণ প্রকৃত চেষ্টার অন্তর্গত।

জমিদারী

কতকগুলি বাঙ্গালীর ব্যবসা জমিদারী। কিছু পয়সা হইলে সকলেরই আকাঙ্ক্ষা জমিদারী কিনিব। বাঙ্গালা, বিহারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইহা এক ফল। গবর্ণমেণ্ট কর আদায়ের সুবিধার জন্য

জমিজমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; যাঁহার সহিত করিলেন তিনি জমিদার হইয়া বসিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট খাজনা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া প্রজার সহিত ইচ্ছানুরূপ খাজনার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের খাজনার বৃদ্ধি নাই, কিন্তু প্রজার দেয় খাজনার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কারণ ইহা জমিদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অতএব জমিদারী ব্যবসার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। জমিদারী কিনিয়া প্রজার দেয় খাজনার বৃদ্ধি করিতে পারিলেই লাভ। আজকাল আইন দ্বারা এই খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ ও সময় বাঁধিয়া দিয়া কিছু প্রতিকারের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু জমির পরিমাণ মাপ করিয়া বা প্রতারণা দ্বারা প্রজাকে হয়রাণ করিবার এত উপায় আছে যে, তাহা প্রজাদের প্রাণান্তকর। বর্দ্ধিত হারে মিথ্যা রসিদ লিখিয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা ইহা আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলেই হইল। জমিজমা এইরূপ মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা বিনাকারণে হস্তান্তরিত হইয়া যায়। বিহারের অবস্থা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই দেখিবেন যে, সাধারণ প্রজা প্রায় কুলীর অবস্থাতে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কাহারও জমিজমা নাই; প্রায় প্রতি বৎসরের জন্য জমি ইজারা লইয়া চাষ করে। সারা বৎসর খাটিয়া যদি কিছু ফসল জমাইতে পারিল, দিন গুজরান হইল। আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণে ফসল যথেষ্ট পরিমাণ না হইলে দেয় খাজনার টাকাই উঠে না, ইহা দিবার জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্থান যাহা থাকে, গরু, ছাগল, গহনা, ঘটী, বাটি ইত্যাদি, তাহাও বিক্রয় করিতে হয়। জার্মানীর কৃত্রিম নীলের পর নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়াছে। নীলকরেরা এখন প্রকৃতপক্ষে জমিদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জমিদার দেশীয় হইলেও নীলকরেরা ঠিকমত খাজনা আদায় করিতে পারে বলিয়া অধিকাংশ

জমিদারই জমিদারীর ইজারা নীলকরদিগকে দিয়া নিশ্চিন্ত হন। নীলকরদের প্রজাদিগকে আটক রাখিবার গারদ আছে; প্রজাদের গরুবাছুর আটক রাখিবার জন্য খোঁয়াড় আছে, প্রজাদিগকে কায়দায় রাখিবার জন্য বরকন্দাজ খালাসী আছে, আরও কত কি আছে। এই সমস্ত কারণে বিহারে ধনী জমিদার এবং প্রায় কুলী দিন মজুরে পরিণত প্রজা—এই দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। আর এক শ্রেণী গবর্ণমেণ্টের চাকুরীয়া। বাঙ্গালার অবস্থাও ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

পঞ্জাবের রায় বাহাদুর স্যার গঙ্গারামের কথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বহুদিন চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবে নূতন খাল কাটিয়া যে-সব জমির আবাদের বন্দোবস্ত হইয়াছে এইরূপ বিস্তৃত জমি লইয়া চাষ আবাদের বন্দোবস্ত তিনিও করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন জমিদার হইয়াছিলেন। নিজের গ্রামের পত্তন করিয়াছিলেন, প্রজাদের জন্য সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন, শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং আরও নানা সুবিধার মধ্যে রেল ষ্টেশন হইতে গ্রামে যাইবার জন্য ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত বসাইয়াছিলেন। "কৃষি সম্বন্ধে পঞ্জাবে প্রচলিত ডাকের বচন" এই বিষয়ে তিনি সিমলায় এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বিতরিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন যে, তিনি একবার বিহারের গ্রামের অবস্থা দেখিতে যান এবং অর্দ্ধনগ্ন কঙ্কালসার প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল কি তাহা বেশ অনুভব করেন। তিনি বলেন, এই বন্দোবস্তের ফল প্রজাদের সহিত

জমিদারের অসহযোগ। আর সহযোগের ফল কত শান্তিময় তাহা তাঁহার জমিদারীতে গিয়া দেখিতে সকলকেই আহ্বান করেন। এই সূত্রে তিনি অহঙ্কার করিয়া বলেন, তাঁহার গ্রামের যে-কোন পাঁচটি যুবক বাঙ্গালা বিহারের যে-কোন গ্রামের সমস্ত লোককে ছাগল ও ভেড়ার পালের মত তাড়াইয়া দিতে পারে। বাঙ্গালার কোন জমিদার ইহার পাল্টা জবাব দিতে পারেন কি? বাঙ্গালায় যে মহচ্চরিত্র, প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী জমিদার নাই তাহা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহারা এখন একনিয়মে বাঁধা পড়িয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম রাখিয়া ইহার কুফল প্রশমনের উপায় যে করা যায় না তাহা বিশ্বাস হয় না। চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন।

অপরিমিত খাজনা বৃদ্ধির কুফল যে কি তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঙ্গালার কয়েকটি জেলাতে এক সময় বহু পরিমাণে রেশম-কীট পালন করা হইত এবং ইহাতে প্রজাদের লাভও যথেষ্ট হইত। রেশমকীট তুঁতের পাতা খায়; এই তুঁতের জমির খাজনার হার কোন কোন জমিতে প্রতি বিঘায় পনর-ষোল টাকা। যখন লাভ হইত প্রজারা অনায়াসে এই খাজনা দিত। তার পর রেশমকীট পালনের লাভ যখন কম হইতে লাগিল তখন প্রজারা অত উচ্চ হারে খাজনা দিয়া কাজ চালাইতে পারিল না। বাঙ্গালার রেশমকীট পালনের অবনতির অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ। বাঙ্গালার রেশমই প্রথমে জগতে প্রসিদ্ধ ছিল, এখন কিন্তু বাঙ্গালায় রেশমের স্থান নাই। রেশমশিল্প সম্বন্ধে অন্য পুস্তকে বলিব।

বাঙ্গালার ভিতর বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর খুব বড় জমিদার। ইঁহার জমিদারী পত্তনিস্বত্বে বিলি করা আছে। বহু গ্রাম লইয়া এক এক লাট, এক এক লাটের সম্যক খাজনার পরিমাণ

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পরিমাণ প্রজাদের নিকট প্রাপ্য খাজনার পরিমাণের চেয়ে কম। হয়ত কোন লাটের জন্য বর্দ্ধমানাধিপতির নির্দ্দিষ্ট খাজনা এক হাজার টাকা, কিন্তু প্রজাদের নিকট হইতে আদায় হয় পনর শত টাকা। অতএব যিনি বন্দোবস্ত লয়েন তাঁহার, অর্থাৎ পত্তনিদারের, প্রাপ্য হইল পাঁচ শত টাকা। পত্তনিদারকে নিজের লোক রাখিয়া সকল প্রজার নিকট হইতে এই খাজনা আদায় করিতে হইবে। কোন প্রজার নিকট হইতে আট আনা, কাহারও নিকট এক টাকা, এইরূপে পত্তনিদারকে চারিদিক হইতে কুড়াইয়া জড় করিতে হইবে। পত্তনিদার সম্যক আদায় করিতে পারুক বা না পারুক, বর্দ্ধমানাধিপতির সর্ত্ত হইতেছে যে, তাঁহার প্রাপ্য খাজনা পত্তনিদারের নিকট হইতে দুই কিস্তিতে আদায় হইবে। এই দুই কিস্তির দিন স্থির আছে এবং ঐ দিনের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেয় খাজনা উপস্থিত করিতে না পারিলেই লাট নিলাম করা হইবে, এবং যিনি ডাকিয়া লইবেন তিনি নূতন পত্তনিদার হইবেন। ঐ যে পাঁচশত টাকা লাভ থাকে তাহার মোহে কত লোক নিলামী লাট ডাকিবার জন্য উপস্থিত থাকে। আশা যে একবার জমিদারী করিবে। আট আনা, এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করা কত কষ্ট ও সময়-সাপেক্ষ তাহা যাঁহারা এই কাজ না করিয়াছেন তাঁহারা সহজে অনুমান করিতে পারিবেন না, অধিকাংশ সময়ে পত্তনিদারকে নিজের ঘর হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে টাকা বাহির করিতে হয়। যতদিন পূর্ব্ব-সঞ্চিত বা অন্য উপায়ে অর্জ্জিত টাকা থাকে ততদিন পত্তনিদারই, অর্থাৎ—ভুয়া জমিদারগিরি চলে, তাহা না হইলে সূর্য্যাস্তের দিন উচ্চ সুদে ধার করিয়া টাকা দাখিল করা হয়। এই টাকা ধার দিবার জন্য মহাজনও টাকার থলি লইয়া উপস্থিত থাকে; শেষে পত্তনি

নিলাম হইয়া হস্তান্তরিত হয় এবং পত্তনিদার সঞ্চিত অর্থও হারায়, অধিকন্তু ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে। এইরূপে পত্তনির মহাল প্রায়ই হস্তান্তরিত হয়। এই ব্যাপারে প্রজাদের যে কতরূপ হয়রানি, কত সেলামীর দাবী, খাজনা বৃদ্ধির দাবী, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারের প্রয়োজন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাঠ্যাবস্থায় একবার ছুটির সময় বাড়ীতে ছিলাম; দ্বারকেশ্বর নদীর নিকট আমাদের গ্রাম, একদিন সকালে নদীর পরপারে মহা গোলমাল উপস্থিত। বহুলোক চীৎকার করিতেছে, নিকটে গিয়া দেখি এক জমির ধান লইয়া বিবাদ। কেহ বা ধান কাটিতেছে, কেহ বা কতক লইয়া পলাইতেছে; কেহ বা পায়ে দলিয়া ধান নষ্ট করিয়া দিতেছে। কয়েকজন বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এক উকিল নূতন লাট কিনিয়াছেন এবং দখল লইতেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে অধিকাংশই লুট হইয়া গেল এবং যাহা পড়িয়া রহিল তাহা এরূপ ভাবে নষ্ট করা হইল যে, চাষী একটা ধানও ঘরে লইয়া যাইতে পারিল না। দুই কৃষক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিল, তাহার পর গ্রামের মুখ্যের সহিত আমারই পিতৃব্যের নিকট পরামর্শ লইতে আসিল, কি করিবে। থানায় লুটের ডায়েরী করা হইল, ফল অবশ্য কিছুই হইল না। চাষীর বহুকষ্টে অর্জ্জিত বৎসরের উদরান্নের সংস্থান নির্দ্দয়ভাবে নষ্ট করা হইল। অভুক্ত কৃষক-পরিবারের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের ফল ভোগ করিবে কে?

এই যে জমিদারী এক হাত হইতে অপর হাতে যাওয়ার কথা বলিলাম ইহার ফল কি দাঁড়াইতেছে তাহা যাঁহারা পল্লী ও মফঃস্বলের খবরাখবর না রাখেন তাঁহারা জানেন না এবং এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। বাঙ্গালী এখন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসাদারা মাড়োয়ারীরা

সামান্য অবস্থা হইতে অল্পদিনের মধ্যে লক্ষপতি হয় এবং জমি, বাড়ী ও জমিদারী বন্ধক রাখিয়া ঋণ দান করে এবং পরে ইহাদের মালিক হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতায় জমি-জায়গার মালিক এখন কে তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। মফঃস্বলেও অনেকস্থলে এখন মাড়োয়ারীরাই মালিক হইয়া দাঁড়াইতেছে বা দাঁড়াইয়াছে। আর বাঙ্গালী হইয়াছে বা হইতেছে দাসের দাস, দাসানুদাস। নিজের দেশে নিজের ব্যবসাবাণিজ্য পরের হাতে দিয়া চাকুরির খোঁজে ছুটাছুটি করিয়া বাঙ্গালী আজ কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কোন্ পথে চলিয়াছে তাহা কি তাহারা চিন্তা করিবে না?

বাঙ্গালায় পশ্চিমাভীতি

বাঙ্গালার জমিদার পত্তনিদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য পশ্চিমা দারোয়ান, নগ্‌দী, আর্দ্দালী রাখেন, ইহাদের অস্ত্র ও নিত্য সহচর বড় বড় বাঁশের লাঠি। ইহাদিগকে রাখার উদ্দেশ্য প্রজাদিগকে ধম্‌কাইয়া ভয় দেখাইয়া খাজনা আদায় করা। উৎপীড়নও যে হয় না তাহা নয়। বাঙ্গালার থানার কন্‌ষ্টবলেরাও পশ্চিমা, অল্পবেতন-ভোগী নিরক্ষর এই সকল লোক পল্লীবাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে। গ্রামের সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক আছে তাঁহারাই দেখিবেন নিরীহ গ্রামবাসীরা এই সকল পশ্চিমা লোকদিগকে ভয় করে এই ভয়ের কারণ জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত এই সকল লোকের অত্যাচার। অত্যাচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘুষ আদায়ের উপায়। এই অত্যাচারের প্রতিকার সহজে হয় না। এই ভীতি বাঙ্গালার পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত কাজের জন্য যত শীঘ্র বঙ্গদেশীয় লোক নিযুক্ত হয় ততই মঙ্গল।

মোকদ্দমা-সমস্যা

ইংরেজ-রাজ বিচারালয় স্থাপন করিয়াছেন ন্যায় বিচারের জন্য। লোকের বিশ্বাস ন্যায় বিচারের উপরই ইংরেজ রাজত্বের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহার কয়েকটি কুফলের কথাই এখানে আলোচনা করিব। কুফলগুলির প্রতিকার প্রয়োজন।

চৌর্য্য অপরাধ, কলহবিবাদ, ছোট-বড় সম্পত্তির স্বত্বাস্বত্ব এবং ব্যবসাবাণিজ্যে ন্যায়অন্যায় বিচারের জন্য বিচারালয়। বিচারপতি প্রমাণ, সাক্ষীসাবুদ দেখিয়া শুনিয়া সত্যমিথ্যা স্থির করেন এবং এই সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণের উপবই বিচার। আইনকানুনের এত জটিলতা যে, সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেও বুঝা দুঃসাধ্য। জার্ম্মাণীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডিবেলিয়স্ ইংলণ্ড সম্বন্ধে একখানি অতি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের আইনকানুন কত জটিল এবং এই জটিলতা ইংলণ্ডের আইন-ব্যবসায়ীদের আয়ের এক প্রধান কারণ, আর তাই আইন-ব্যবসায়ীরা এই জটিলতা দূরীকরণের বিরোধী। এই রোগ আম্যদের দেশেও আসিয়াছে এবং আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার অভাবের অবস্থায় এত জটিল আইনের প্রয়োজন আছে কি-না ইহাই বিচার্য্য। আইনের আশ্রয় লইতে হইলেই উকিল-মোক্তাররূপী দালালের প্রয়োজন। এই দালালীই উকিল-মোক্তারের জীবিকা। জীবিকার জন্য মফঃস্বলের উকিল-মোক্তারেরা কত সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিয়া চালাইতে বাধ্য হন তাহা আদালতে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তাই সাধ্যপক্ষে কোন ভদ্রসন্তান আদালতের

সীমানার ভিতর পদার্পণ করিতে রাজী হন না; অথচ লোকে দায়ে পড়িয়া উকিল-মোক্তারকে দক্ষিণা এত বেশী দিতে বাধ্য হয় যে, বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল উকিল-মোক্তারেরাই ধনী, কিন্তু এই ধনার্জ্জন আমাদেরই দেশের রক্ত শোষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাঙ্গালা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য জমিজমা ও জমিদারীর স্বত্বাস্বত্ব লইয়া এত মোকদ্দমা হয় যে উকিল-মোক্তারের দক্ষিণার আয় খুব বেশী। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই দক্ষিণা আসে মূলে জমির উপস্বত্ব হইতে, অর্থাৎ—কৃষকদের নিকট হইতে। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, কৃষক ও জমিদার গরীব হইয়া পড়িয়াছে। অনেক উকিল-মোক্তাব এখন তাঁহাদের স্থানে জমিদার হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থাও যে আবার একদিন একই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ভাবে চলিয়াছে এই ভাবে চলিলে সমস্ত দেশই মাড়োয়ারীদের হাতে যাইবে। অবস্থাটা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

উকিল-মোক্তারশ্রেণী ইংরেজ-রাজের সৃষ্টি। উপার্জ্জন বেশী হওয়ায় এই শ্রেণীর মধ্যেই আমাদের বুদ্ধিমান ব্যক্তি অধিক আছেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইঁহারা এক নিয়মে বাঁধা পড়িয়াছেন এবং এই বন্ধনীর মধ্যে তাঁহাদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা যদি শিল্পবাণিজ্যে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ করিবার. সুবিধা পাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা উহার কর্ণধার হইতে পারিতেন। চিন্তা বা পরামর্শ করিয়া যাহাতে ইহার উপায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা এখনই কর্ত্তব্য।

আমাদের বিচারালয়ের অবস্থা কি? পেয়াদা, আর্দালি, কেরাণী, আমলা মোক্তার উকিল—সকলেই ছোঁ পাতিয়া আছে, কাহার নিকট

কি উপায়ে দু-পয়সা আদায় করিতে পারে। যাঁহারা আদালতে যাইতে বাধ্য হন তাঁহাদের এবং বিশেষ করিয়া অজ্ঞ কৃষকদিগের, কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। চলিত কথায় ইহার বর্ণনা হইতেছে যে, আদালতের টিকটিকিটাও চোর। বিচারপতি হয়ত দু-হাজার টাকা বেতন পান। কিন্তু তাঁহার কেরাণী যিনি কাগজ-পত্র তাঁহার নিকট পেস্ করিবেন এবং যিনি ইচ্ছা করিলে মোকদ্দমা আগাইয়া বা পিছাইয়া দিবার এবং অপর নানাদিকে কল নাড়িতে পারেন তাঁহার বেতন হয়ত পঞ্চাশ টাকা। তিনি কোনরূপ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ঘুষের লোভ সংবরণ করিতে পারেন কি ?

তারপর কোন ঘটনা হয়ত ঘটিয়াছে গ্রামে এবং বিচার হইবে জেলার সদরে। সঙ্গিগণ সহ সদরে আসা, পেয়াদা আমলা উকিল মোক্তারের দক্ষিণা দেওয়া এবং ঘটনাস্থল হইতে এত দূরে সত্য মিথ্যা প্রমাণ করা অশিক্ষিত লোকদের উপর ন্যায় বিচারের নামে কত দূর অবিচার হয় তাহা যাহারা নিজে দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এক গ্রামের এক রেষারেষী ও মারামারি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নালিশ মোকদ্দমা হইল। বিচারে যাহা সত্য তাহা মিথ্যা এবং যাহা মিথ্যা তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিচারপতি এক এম-এ উপাধিধারী ডেপুটী এবং উভয় পক্ষেই বি-এ, বি-এল উকিল ও মোক্তার। এই ত বিচার! পয়সা খরচ করিলে আদালতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করান যায়। এবং প্রতিপন্ন করাও নিত্যই হইতেছে। দুরভিসন্ধিযুক্ত লোকের পক্ষে আদালত এখন অত্যাচার-উৎপীড়নের এক যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ এক ব্যক্তিকে গর্ব্ব করিতে শুনিয়াছিলাম যে, ইংরেজের রাজত্বে মোকদ্দমাই লড়াই। আর লড়াইয়ের লক্ষ্য কোনরূপে জিত,

সত্যমিথ্যা, ন্যায়অন্যায়—যে-কোন উপায়েই হোক। জমিদার প্রজাকে এইরূপ লড়াই দ্বারা হয়রান করেন। প্রকৃত শিক্ষা মনের প্রশস্ততা এবং নানা বিষয়ের জ্ঞানার্জ্জনজনিত উচ্চ চিন্তার অভাবে বাঙ্গালার শহরে ও পল্লীতে, এমন কি শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল বিদেশাগত বাঙ্গালীদের মধ্যেও, দলাদলি খুব প্রবল। আর এই দলাদলিতে আক্রোশ মিটাইবার জন্যও আদালত এক ঘৃণিত যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার শীঘ্র শেষ হয়। কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমা একবার আরম্ভ হইলে বলিতে গেলে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে চলিতে থাকে। ন্যায়বিচার যেখানে হয় তাহাও অতি ব্যয়সাপেক্ষ। মোকদ্দমায় অবশেষে জয়লাভ হইলেও জয়ী পক্ষও হৃতসর্ব্বস্ব এবং দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন এইরূপ প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের দরিদ্র দেশে এই সকলের প্রতিকার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগকেই চিন্তা করিয়া প্রতিকার নির্দ্ধারণ ও গ্রহণ করিতে হইবে। এক উপায় হইতেছে জনসাধারণের প্রকৃত ও উন্নত শিক্ষা।

আমাদের নামজাদা উকিল-ব্যারিষ্টার মহাশয়েরা প্রত্যহ হাজার দেড় হাজার টাকা ফি আদায় করেন। অনেক মোকদ্দমা বহু দিন ধরিয়া চলে। জেদবশত জমিদার ও ধনীরা এই ব্যয়ভার বহন করেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ঋণগ্রস্ত হইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন। মাম্‌লামোকদ্দমার এই ক্ষতিকর মোহ হইতে দেশকে রক্ষা করা এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পল্লী-সমস্যা

পল্লী লইয়াই বাঙ্গালা। পল্লীর উন্নতিতেই বাঙ্গালার উন্নতি ও জাতীয় মঙ্গল। পল্লী-সংগঠনপ্রস্তাব অনেক হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কাজ এখনও কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়।

সমাজ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা পল্লীতে যেমন, শহরে তেমন নয়। পল্লীতে সকলেই আপন। যাহাদিগকে ছুঁইলে স্নান করি তাহাদেরও সহিত খুড়া জ্যেঠা সম্পর্ক পাতাই। শহরে আপন জনও তেমন আপন নহে। কাজেকাজেই শহরে নৈতিক অধঃপতন বেশী হয়। বাঙ্গালার পল্লীতে সকল শ্রেণীই উচ্চনৈতিক স্তরে অবস্থিত। পল্লী ছাড়িয়া এবং পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কলকারখানার এবং শহরে নানা স্থানের লোক জীবিকার জন্য যখন একত্রিত হয় তখন তাহাদের নৈতিক অবনতির সম্ভাবনা হয়। পল্লীতে সুস্থ শরীরে এবং মনের সুখে জীবন কাটান যায়। কলকারখানার দেশ বিলাত আমেরিকাতেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পল্লীসংস্থাপনের প্রয়াস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যর রাইডার হ্যাগার্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি রুজ্‌ভেল্ট, বিখ্যাত মোটর প্রস্তুতকারক ক্রোরপতি হেন্‌রী ফোর্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই হইল পল্লীর উৎকৃষ্ট দিক।

শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালার পল্লীর অপরদিকের আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে প্রধান কূপমণ্ডুকত্ব, যাহা উন্নতির অন্তরায় এবং অবনতির সহায়ক। ইহাতে আমাদের যাহা আছে তাহাই ভাল, আর সবই মন্দ, এই ভাব সৃষ্টি করে, মন ক্ষুদ্র হইয়া যায়, এবং অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। জগতের খবরাখবর না রাখিলে সকলেই কূপ-মণ্ডুকত্ব প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। ইহা দূর করিবার বা নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা, সার্ব্বজনীন শিক্ষা। যদি পৃথিবীর খবরাখবর

জানা যায়, অন্যান্য দেশবাসীর উন্নতি কি করিয়া হইতেছে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে মনে আপনা হইতেই নিজেদের উন্নতির চেষ্টা জাগরিত হয়। তাহার উপর অপরের সহিত যদি স্বার্থহানি বা লাভের সম্বন্ধ দাঁড়ায় তাহা হইলে এই চেষ্টা বলবতী হয়।

ইংরেজের বাসস্থান সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপে। অপর দেশের সংশ্রব খুঁজিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল; তাহা না হইলে তাহারা বাঁচিতে পারিত না। বহির্জগতের সহিত এই আদান-প্রদানই ইহাদের এত উন্নতির কারণ। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, যে-সকল জাতি সমুদ্র-কূলের বাসিন্দা, যেমন স্পেন্, পর্তুগাল, ভেনিস্ ইত্যাদি দেশের লোক, তাহারাই কোন-না-কোন কালে বড় হইয়াছে। এমন কি, আমাদের অধুনা পরাধীন এই ভারতবর্ষও। জাপান ইচ্ছা করিয়া প্রায় তিন শত বৎসর বাহিরের সকল দেশের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু যে দিন এই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হইল সেই দিন হইতেই জাপানের উন্নতির সূচনা হইল। চীন ও ভারতবর্ষ বিদ্যা, বুদ্ধি, ও সামর্থ্যে অনেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইলেও কূপমণ্ডুকত্বের জন্যই পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে। মার্কিণ ইংরেজের বংশধর হইলেও ইংরেজকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরাও বোধ হয় শীঘ্রই ছাড়াইয়া যাইবে। ইহারা নূতন দেশে গিয়া নূতন পারিপার্শ্বিকের ফলে এইরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে-নরপতির হয়ত সামান্য একটি জেলা পরিমাণ রাজ্য তাঁহারও সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইত যে, তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। ইহা অপেক্ষা কূপমণ্ডুকত্ব আর কি হইতে পারে? এইরূপ বর্ণনা ছাড়িয়া আমরা যদি আধুনিক অনুন্নত দেশের ইতিহাস দেখি সেখানেও সেই একই ভাব। ব্রহ্মদেশের রাজা মাত্র ছ-চল্লিশ বৎসর

রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরেজের দখলে আসিয়াছে। রাজ্যচ্যুতির প্রধান কারণও এই কূপমণ্ডুকত্ব। তিনি এবং তাঁহার দেশবাসিগণ মনে করিতেন যে, ব্রহ্মদেশের রাজাই পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে বলবান, কারণ ব্রহ্মদেশীয়েরা এক সময় প্রতিবেশী শ্যাম ও আসাম জয় করিয়া লুটপাট করিয়াছিল। ব্রহ্ম-রাজ ভারতেব বড়লাটের চিঠির উত্তব পর্য্যন্ত দেওয়া মর্য্যাদার হানিকর মনে করিয়াছিলেন ; ইংলণ্ডের রাণী নিজে লিখিলে উত্তর দেওয়া চলিত। যখন ইংরেজের সহিত শেষ যুদ্ধেব আয়োজন চলিতেছে তখন মন্ত্রীর পত্নী বলিলেন যে, ইংরেজরা নাকি বেশ ভাল চাকর হয়, তাঁহাব জন্য যেন কয়েকটা চাকর ধরিয়া আনা হয়। এইরূপ কাহারও মালী, কাহারও শকট-চালকের বরাদ্দ হইল। ব্রহ্মদেশবাসীরা যদি বাহিরের সহিত আদান-প্রদান ও বাহিরের খবর রাখিত তাহা হইলে ব্রহ্মদেশও শ্যামদেশের মতই স্বাধীন থাকিত।

বাঙ্গালার পল্লীবাসীরা প্রায়ই বাহিরে কোথাও যাওয়া আসা করে না, এবং করিলেও খুব কমই করে। জেলার সদর পর্য্যন্তও বোধ হয় অনেকেই যায় না। বাহিরের সহিত সম্পর্কহীনতার জন্য তাহাদের একটা আড়ষ্ট ভাব আছে, অর্থাৎ চলিত কথায় তাহারা 'চালাক' নয়। এক পক্ষে বাঙ্গালার ইহা এক প্রকাণ্ড ক্ষতি। বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ইত্যাদি প্রদেশের কৃষকশ্রেণীর বহুলোক অন্নসংস্থানের জন্য বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশে আসিয়াছে। অনেকেই কুলী মজুর, দারোয়ান, চাপরাশীর কাজ করে এবং বেশ দু-পয়সা সঞ্চয়ও করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভবিষ্যতে বড় ব্যবসাদার হইয়া উঠে। এইরূপ একজন লোক এখন অনেকগুলি কেরোসিন তেলের খনির মালিক, এবং বড় ব্যবসায়ী। আর একজন এখন প্রায় দশলক্ষ টাকার

মালিক। একদিন বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের য়্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী রায় বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন বসু বলেন, তিনি রেঙ্গুনে যাহার বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন সে-ব্যক্তি ঘেসেড়া হইয়া আসে এবং মৃত্যু সময়ে পাঁচ-সাত লক্ষ টাকা রাখিয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গালার পল্লীবাসীদের অধিকাংশই কৃষক এবং বৃষ্টির অভাব না হইলে তাহাদের প্রায়ই অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। এই জন্যই রোজগারের সন্ধানে বাহিরে যাওয়ার অনেকেরই প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু পৈত্রিক জমির ভাগবাঁটোয়ারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চলিয়াছে। এই হেতু অনেকের অন্নসংস্থানের উপায় নাই; তাহা হইলেও তাহারা বাহিরে যাইতে চায় না, কেন-না, রেওয়াজ নাই। কিন্তু এখন বাহিরে যাওয়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষার অভাবে এবং কূপমণ্ডুকত্বের প্রভাবে জাতিভেদের দোষ বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর লোকের দ্বারা নীচ বিবেচিত হয় ও আপনাদিগকে নীচ মনে করে এবং এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এই ভাব দূর হইবে তখনই যখন শিক্ষাদ্বারা এবং বাহিরের সহিত আদান-প্রদানে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিবে.

পল্লীর, অতএব জাতির, উন্নতির আর এক অন্তরায় কলিযুগবাদ। আমাদের পল্লীর শিক্ষার ভাব কি ?—এই সংসার মিথ্যা ও কয়েকদিনের জন্য। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, বৃথায় কাটাইও না, অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা কর। এখন কলিযুগ, সবই নিকৃষ্ট ও মন্দ; কলিযুগে ইহার বেশী আর কি হইতে পারে? ভিখারী যে গান গাহিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে তাহারও এই মর্ম্ম। এই ভাবই দিবারাত্র সকলের মনের উপর কার্য্য করিতেছে এবং ইহার ফলস্বরূপ মনের জড়তা দেশের যে

কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষ করিয়া সংস্কার-সর্ব্বস্ব অশিক্ষিত লোকের উপর ইহার প্রভাব বড় মারাত্মক রকম প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় শিক্ষা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, আধুনিক নানা উন্নতির ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা, এমন শিক্ষা যাহা মনে গাঁথিয়া দিবে যে, সত্যযুগ সম্মুখে, পশ্চাতে নয়। আর সত্যযুগে পঁহুছিতে হইলে আপ্রাণ চেষ্টা আবশ্যক। যে যেরূপ চেষ্টা করিবে, সে সেইরূপ ফল লাভ করিবে।

বাঙ্গালার অনেক স্থানের পল্লীর স্বাস্থ্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, পল্লী ছাড়িয়া শহরে গিয়া বাস করিতে পারিলেই লোকে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গালার নরনারী গড়-পড়তা হিসাবে মাত্র একুশ বৎসর বাঁচে। মান্দ্রাজ প্রদেশের পুরুষ বাঁচে ছাব্বিশ বৎসর এবং স্ত্রীলোক সাড়ে-সাতাইশ বৎসর। ব্রহ্মদেশবাসী পুরুষ বাঁচে সাড়ে-একত্রিশ বৎসর এবং স্ত্রীলোক সাড়ে-বত্রিশ বৎসর। জাপানীরা বাঁচে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বৎসর।

খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কি, তাহা খাদ্য-সমস্যা আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি। খাদ্যের উন্নতির সহিত স্বাস্থ্যেরও যে উন্নতি হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। স্বাস্থ্য ভাল হইলে অনেক রোগ কাছে ঘেঁষিতে পারে না। কতক রোগ আছে যাহার বিষ শরীরে প্রবেশ না করিলে সে রোগ হয় না। ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইয়া মশক রোগীর দেহ হইতে বিষ লইয়া সুস্থ লোককে কামড়াইলে সুস্থ লোকের ম্যালেরিয়া হয়। কলেরা রোগীর ভেদবমিতে মাছি বসিয়া তারপর যদি কোন খাদ্যে বসে এবং সেই খাদ্য যদি কেহ খায় তবে নিশ্চয়ই তাহার কলেরা হয়। কলেরা রোগীর ভেদবমি, দূষিত কাপড়-চোপড় কাচিয়া জল দূষিত করিলে এই জল

ব্যবহারেও কলেরা হয়। এইরূপ নানা রোগের তথ্য অবগত হইয়া এবং নিবারণের উপায় অবলম্বন করিয়া অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানও স্বাস্থ্যকর বাসযোগ্য স্থানে পরিণত হইতেছে। এই সকল তথ্য প্রয়োগ করিয়া কার্য্য করিবার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড্ রোগে সময়ে সময়ে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। এই সমস্ত রোগের প্রতিষেধক উপায়গুলি আজকাল হাতে হাতে ফল দেয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমস্তিপুর (দ্বারভাঙ্গা জেলা) মহকুমায় কলেরায় দুই মাসে প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। পুষা এই সকল পল্লীর মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রায় পাঁচশতেরও অধিক অধিবাসীর মধ্যে এক জনেরও কলেরা হয় নাই। এই সমস্ত রোগের প্রতিষেধক অতি সহজ উপায়গুলি পল্লীবাসীদিকে শিক্ষা দিতে পারিলে পল্লীর স্বাস্থ্য ফিরিয়া যায়। রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা প্রত্যক্ষ ফল দিতেছে।

বাঙ্গালায় হুক্‌ওয়াম´ ক্রিমিঘটিত রোগের প্রাবল্য অত্যন্ত বেশী। এই ক্রিমি স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অনিষ্টকারী। রোগীর বিষ্ঠার সহিত ইহার ডিম বাহির হয় এবং মাঠে এই ডিম হইতে যে ক্রিমি ফোটে, যাহারা খালি পায়ে চলাফেরা করে, তাহাদের পায়ের চামড়ার ভিতর ঢুকিয়া ক্রমে শরীরে প্রবেশ করে। বাঙ্গালা দেশের পল্লীবাসী নরনারী মাঠে যেখানে সেখানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে বলিয়া এই ক্রিমি সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া থাকে। এই কারণে এই ক্রিমিঘটিত রোগ বাঙ্গালার প্রায় সকলকেই আক্রমণ করে। ইহার প্রতিকার হইতেছে পায়খানার প্রচলন। বাড়ীর সীমানায় চার পাঁচ হাত গর্ত্ত করিয়া দর্ম্মা ঘেরিয়া পায়খানা করিলে খোলা মাঠে নরনারী সকলের নির্লজ্জভাবে মলমূত্র ত্যাগ নিবারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কৃমিরোগও কমে। এই পায়খানা কোন প্রকারে

ছাইয়া দিলে বর্ষার সময় দূরে মলত্যাগের অসুবিধা দূর হয়। আর যদি এই পায়খানায় মলত্যাগের পর ধূলি বালি বা ছাই ফেলিয়া মল ঢাকা দেওয়া যায় তাহা হইলে দুর্গন্ধও নিবারিত হয় এবং মাছিতে নানা রোগের বীজাণু ছড়াইতে পারে না। মলত্যাগের পর জলশৌচ, স্নান, কাপড় ধোয়া এমন কি মূত্র ত্যাগ করিয়া সেই পুকুরের জলেই রন্ধন এবং সেই জলই পান করা হয়। ছেলেবেলা হইতে সকলেই দেখে যে, এই-রূপই চলিয়া আসিতেছে। অতএব ইহার ঘৃণ্যতা ও অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। অতএব প্রতিকারের চিন্তাও কেহ করে না।

এখন শিক্ষিত অতএব চাকুরিজীবী বাঙ্গালী পল্লী একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে; বড়জোর পূজা বা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের সময় বা বিবাহ উপলক্ষ্যে গিয়া মাত্র দিন কতক পল্লীতে কাটায়। শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই সমাজের মস্তকস্বরূপ, অথচ তাহারা পল্লী ত্যাগ করিয়াছে। তাই পল্লীবাসীরা একপ্রকার মস্তকহীন হইয়াছে। বাল্যকালে দেখিয়াছি আমাদের গ্রামে আমাদের এক বৈঠকখানা, আর সেইরূপ প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী আর এক গ্রামে গোঁসাইদের বৈঠকখানা, পুনরায় অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী সরকারদের এক বৈঠকখানা। এই রূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল গ্রামেই অবস্থাপন্ন লোকদের একাধিক বৈঠকখানা ছিল। বিশেষতঃ বৈকাল বেলায় এই সকল বৈঠকখানা সরগরম থাকিত। তাস, পাসা, দাবা, প্রভৃতি খেলার সঙ্গে হাস্যোদ্দীপক বাক্য এবং উচ্চহাস্য ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকেও আকৃষ্ট করিত, অবসরমত গ্রামবাসীদেরও ভিড় হইত। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ তাহারা খেলার পর রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করিত। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তনও হইত। এই সকল কীর্ত্তনে খোল, করতাল বাজাইত এবং কীর্ত্তন গানও করিত অনেক সময়

কৃষিজীবী যুবক ও বৃদ্ধেরা। কোন কোন দিন হয়ত গ্রামবাসী কাহাদের ঝগড়া বিবাদ হইয়াছে, তুই দলই আসিয়া বৈঠকখানায় নালিশ করিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সাক্ষীসাবুদ শুনিয়া কাহারও আট আনা, চারি আনা জরিমানা হইয়া বিচার হইয়া গেল। তুই দলই বিনা বাক্যব্যয়ে বিচার শিরোধার্য্য করিয়া বাড়ী ফিরিল। কাহারও সন্তান জন্মিয়াছে, সে আসিয়া খবর দিল। অমনি পঞ্জিকা খুলিয়া তিথি আদি বিচার করা হইল। পঞ্জিকার পাতাতেই জন্ম-বিবরণ লিখিয়া রাখা হইল, কেহ বিবাহ বা দ্বিরাগমনের জন্য শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া দিবার প্রার্থনা করিল। গ্রামে কাহারও অসুখ বেশী হইয়াছে তাহার জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। গ্রামে কেহ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে নালিশ না হইলেও গ্রামের মঙ্গলের জন্য তাহার কার্য্যের বিচার-আলোচনা হইল। এখন গ্রামে পঞ্চায়েত-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া এই সকল কার্য্য করিবার প্রয়াস হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে এবং পূর্ব্বের যে অবস্থা বর্ণনা করিলাম তাহাতে তফাৎ কত, বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। পিতাঠাকুর ও খুড়ামহাশয় গ্রামেই ছিলেন; গ্রামবাসীদের সহিত সকল বিষয়ে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল এবং কাজেকাজেই তাঁহাদের প্রতিপত্তিও ছিল; কাজেই তাঁহারাই ছিলেন গ্রামের স্বাভাবিক নেতা।

পল্লীর শিক্ষার উপায় রামায়ণ, কথকতা, যাত্রার বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রামের কেহ পুণ্যের জন্য কথকঠাকুর আনাইয়া কয়েক দিন হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত কথকতা করাইতেছেন। প্রতি সন্ধ্যায় হয়। কথকঠাকুরের জন্য বৈঠকখানায় আসন। শ্রোতারা রাস্তা, ময়দান গাছতলা, যে যেখানে পারে বসে। মনে আছে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে পড়িতাম, কিন্তু প্রতিদিনই কথকঠাকুরের কথা শুনিতে যাইতাম এবং ধ্রুব-চরিত্রের কথার সময় কতই না কাঁদিয়াছি। সেই

রূপ কতদিন ধরিয়া কেহ হয়ত রামায়ণ গাওয়াইতেছেন। খালি গায়ে পাকান চাদর স্কন্ধে জড়াইয়া শামলা মাথায় দিয়া, হাতে চামর লইয়া এবং পায়ে নূপুর পরিয়া মূল গায়ক, মন্দিরা হাতে ও পায়ে নূপুর-পরা দলের সঙ্গে গান করেন। গান ও নাচের ভঙ্গী ছোট ছোট বালক বালিকাদেরও চিত্তাকর্ষক। লোকের ভিড় কত। গায়কদিগকে কত রকমের উপহার দেওয়া হয়। একদিন মূলগায়ককে কেহ মস্ত লম্বা বড় বড় ফুলুরীর মালা পরাইয়া দিল। এই রূপ কোনদিন কদ্‌মার, কোন দিন বাতাসার, কোনদিন ফুলের, আরও কত কি প্রতিযোগিতা। যাত্রা বেশী ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া মধ্যে মধ্যে হইত। চারিদিকের পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর হইতে লোক আসিয়া যাত্রা শুনিত। আমার মনে আছে গ্রামে যাত্রার দল আসিলে তাহাদের আগমন হইতে প্রস্থানের সময়ের মধ্যে তাহাদের এবং তাহাদের কার্য্যকলাপের সমস্ত খবর আমার নিকট থাকিত। বৎসরের মধ্যে একবার দুইবার অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, নয় দিন নয়রাত্রি ধরিয়া কীর্ত্তন হইত। দিবারাত্র নাচগান আনন্দ।

এই সকলের তিরোধানের জন্য অনেকেই আক্ষেপ করেন; কিন্তু এ সকল আর ফিরিয়া আসিবে কি-না সন্দেহ। এখন ইহাদের বদলে সময়োপযোগী লোকশিক্ষার এবং গ্রামবাসীদের আমোদ-প্রমোদের প্রবর্ত্তন আবশ্যক। আমোদ-প্রমোদ, হাসিতামাসা স্বাস্থ্যের সহায়ক। যাহারা প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারে এবং আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতে পারে তাহারা দীর্ঘজীবী হয়।

কৃষিসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষক-পরিবারের বংশলোপের কথার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থের দেখাদেখি অপর শ্রেণীর লোকেরাও বিধবা বিবাহ

করে না। ইহাদের বংশলোপের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। কৃষকশ্রেণীর মধ্যে কন্যার অল্পতাহেতুই বোধ হয় অনেক স্থলে পণ দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। আমি দেখিয়াছি কয়েকজন কন্যা সংগ্রহ করিতে পারিল না। কেহ কেহ জমিজমা বিক্রয় করিয়া প্রায় অর্দ্ধবয়সে বা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে চার-পাঁচ বৎসর বয়স্ক কন্যা বিবাহ করিল, অধিকাংশ স্থলেই ফল কি হইল বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পল্লী এবং কৃষির কল্যাণের জন্য এই সকল লোকের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং ভিন্ন ভিন্ন অথচ সমশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলন বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উপদেশ ও শিক্ষার দ্বারাই ইহা সম্ভব। ইহারা নিজেরাই করিবে এই রূপ আশায় বসিয়া থাকিলে কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পল্লীর উন্নতির জন্য এখন বুদ্ধিমান নেতৃস্থানীয় লোকের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া এইরূপ নেতা পাওয়া যাইতে পারে পরে বলিতেছি। পল্লীর এখন প্রয়োজন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি—

১। কৃষির উন্নতি।

২। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের এবং পল্লীবাসীর প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির ক্রয়ের সুবিধা।

৩। অল্প সুদে পল্লীবাসীর বিশেষ করিয়া কৃষকদের অর্থ-সাহায্যের সুবিধা।

৪। উপযোগী শিল্প ও উপশিল্প সৃজন ও প্রচলন।

৫। গমনাগমনের জন্য রাস্তা, ট্রাম ও রেলের সুবিধা এবং ভাবের আদান-প্রদান, শীঘ্র শীঘ্র ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি যাহাতে করা যায় তাহার জন্য ডাক, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের সুবিধা।

৬। বালক-বালিকা যুবা প্রৌঢ়, এমন কি, বৃদ্ধদেরও শিক্ষার সুবিধা।

৭। পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৮। পল্লীবাসীর আমোদ-প্রমোদের সুবিধা।

৯। পল্লীর বাসস্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি।

১০। পল্লীবাসী সকলের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধন এবং সহযোগ প্রতিষ্ঠা।

১১। সমগ্র সমাজের দোষ দূরীকরণ, সমাজের কল্যাণকর রীতি-নীতির প্রচলন এবং সমাজের উন্নতি। সমাজ বলিতে দেশবাসী সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই ধরিতেছি।

প্রস্তাবিত জননী প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইবে।

কৃষি-সমস্যা

দেশের ধনাগমের উপায় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা। বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প হইতে হটিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর জন, অর্থাৎ প্রত্যেক চারিজনের মধ্যে তিন জন কৃষিজীবী।

বাঙ্গালা দেশে খনিজ পদার্থ বা বন জঙ্গল প্রায় নাই বলিলেই হয়। বাঙ্গালার কৃষিই লক্ষ্মী। কৃষির উন্নতির সঙ্গে বাঙ্গালার উন্নতি এবং কৃষির অবনতির সঙ্গে বাঙ্গালার অবনতি। পল্লীগ্রামের প্রায় সকলেই কৃষির উপর নির্ভর করে। পল্লী-সমস্যা বলিতে প্রধানতঃ কৃষি সমস্যা। কৃষির উন্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবীরও উন্নতি হয়। সে ভাল খাবার পাইতে পারে, ভাল পরিতে পারে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে পারে, পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে

পারে; সর্ব্ববিষয়ে গ্রামকে উন্নত করিতে পারে। অতএব কৃষির উন্নতি অবনতি বাঙ্গালার পল্লীতে কিসে হয় তাহার যথাযোগ্য উপায় বা প্রতিকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির জন্য বহুব্যয়ে রয়েল কমিশন বসিয়াছিল। কমিশন না বসিলেও কৃষির উন্নতি-অবনতির কারণগুলি প্রায় সকলেরই জানা আছে। অপর অনেক দেশের কৃষির ও কৃষিজীবীর উন্নতি কেমন করিয়া হইল তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আসল কথা হইতেছে, প্রকৃত কার্য্য দ্বারা উন্নতির চেষ্টা করা এবং অবনতির প্রতিকার চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কোন কমিশনের অপেক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই।

বাঁকুড়া জেলার গ্রামের অবস্থা বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার প্রায় সকল গ্রাম সম্বন্ধেই বোধ হয় এ কথা খাটে। বড় বড় কৃষক-পরিবার প্রায় লোপ পাইতেছে। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই ঘোষ উপাধিধারী সদ্‌গোপ জাতীয়। বাল্যকালে দেখিয়াছি, গৌর ঘোষের বৃহৎ পরিবার, বড় বড় ধানের গোলা। আক, কলাই, প্রভৃতির বৃহৎ চাষ। আক মাড়িবার সময় কতদিন ধরিয়া কল বসিত এবং কত গুড় তৈয়ারী হইত। সেইরূপ নন্দ ঘোষ এবং জীবন ঘোষেরও বৃহৎ পরিবার দেখিয়াছি। শুনিয়াছি কল্যাদের ইহাদের সকলের অপেক্ষাও বৃহৎ পরিবার এবং বিস্তৃত চাষ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রামে এখন একটিও এরূপ বৃহৎ কৃষক-পরিবার আর নাই। নন্দ ঘোষ, গৌর ঘোষ এবং কল্যাদের গোষ্ঠী গত ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। অথচ অধিকাংশ স্থলে যে-জমি চাষ করিয়া ইহারা সঙ্গতিপন্ন ছিল সেই সকল জমি আজও রহিয়াছে।

যখনই কোন কৃষকের তিন চারি পুত্র কর্ম্মঠ হইয়া উঠিল তাহার অবস্থাও ফিরিল। কৃষকের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রেরা যতদিন একান্নবর্ত্তী থাকে ততদিন তাহাদের অবস্থা বেশ ভাল থাকে। তাহার পর যখনই পৃথক হইল, পৈত্রিক জমি ভাগ করিয়া নিজে নিজে মজুরের সাহায্যে চাষ করিতে আরম্ভ করিল, অমনই পতন আরম্ভ হইল। এইরূপে গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কয়েক পরিবারের উত্থান ও পতন দেখিলাম। আমাদের দেশের কৃষকদের দশ-বিশ বা ত্রিশ বিঘা জমি লইয়া চাষ। এই চাষের উপস্বত্ব বা খরচ বাদে আয় কম। যতদিন কৃষক-পরিবার নিজ পরিশ্রম দ্বারা চাষ করে এবং পরিশ্রমের ফল স্বরূপ উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে ততদিন তাহাদের অবস্থা সচ্ছল বা solvent ; যখন কুলীমজুর খাটাইয়া এই সকল কুলী মজুরদের সহিত উৎপন্ন ভাগ করিতে হয়, তখনই অবস্থা অসচ্ছল বা insolvent. তাহার উপর নিজে নিজের জমি চাষ এবং অপরের দ্বারা চাষের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। আমাদের দেশের কৃষকদের অল্প জমি লইয়া চাষের প্রকৃত ভিত্তি কো-অপারেশন বা সহযোগ, বা সমবায়। আপন জন বা ভ্রাতাদের সহিত যতদিন সহযোগ থাকে ততদিন ভিত্তি পাকা থাকে, তাহা না হইলেই ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায়।

জমির মাঝামাঝি আল দিয়া যে পৈত্রিক জমি ভাগ করা হয় ইহার মত ক্ষতিকর প্রথা আর নাই। টুক্‌রা টুক্‌রা জমি আবার গ্রামের চারিধারে ছড়ান। একত্রে দশ বিঘা জমির চাষ টুক্‌রা টুক্‌রা এবং নানা স্থানে ছড়ান বিশ-ত্রিশ বিঘা জমির সমান। একত্রে দশ-পনর বিঘা জমি পাইলেই কৃষকেরা কূপ খননাদি দ্বারা নানা উপায়ে জমির উন্নতি করে, এবং ইহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। নানা স্থানে টুক্‌রা টুক্‌রা ছড়ান জমি আপোষে বদল করিয়া যদি কৃষকেরা নিজ নিজ

চাষের জমি একত্র করে তাহা হইলে কৃষকেরা উপকৃত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিমান এবং স্বার্থহীন নেতা; তারপর প্রয়োজন হইলে আইন করিয়া সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া।

উপরন্তু এইরূপ কৃষিজীবীদের সঞ্চিত অর্থ নাই। তাহাদের মূলধন হইল জমিটুকু এবং বলদ ও নিজের পরিশ্রম। অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, গোমড়ক এবং নিজের অসুখ, এই সকল কারণে তাহার মূলধন হইতে সকল বৎসর সমান বা নিশ্চিত আয় হয় না। কতক এই সকল কারণে, কতক সামাজিক রীতির জন্য, যেমন শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদির খরচের জন্য কৃষিজীবীমাত্রেরই ঋণের প্রয়োজন হয়। ঋণ-দাতার লোলুপদৃষ্টি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই তাহার জমিটুকুর উপর পড়ে। অধিকাংশ স্থলেই হয়ত সেই জমির উপরেই পূর্ব্ব ঋণ আছে। কাজে-কাজেই সুদের হার উচ্চ। কৃষিজীবী মাত্রেরই ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন হইবেই। কম সুদে এই ঋণ পাইবার ব্যবস্থা সমবায় ছাড়া হইতে পারে না। সমবায়ের কথা পরে বলিব।

জমিদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ায় যে অপকার হইয়াছে তাহার কিছু কিছু 'জমিদারী'র বিষয় আলোচনার সময় বলিয়াছি। ইহার আর এক বিশেষ অনিষ্টকর ফল এই হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের সহিত জমির সম্পর্ক লোপ পাইয়াছে, খাল কাটিয়া বা অন্য প্রকারে জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া জমির উৎকর্ষসাধন করিবার গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ ও প্রয়াস নাই। অনেক স্থলেই জল পাইলে কৃষকেরা জমিতে সোনা ফলাইতে পারে। সমবায় দ্বারা জলসেচনের বন্দোবস্ত হইতে পারে।

সকল দেশেই কৃষিজীবীরা ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, রেশমকীট, লাক্ষাকীট ও মৌমাছি পালন করিয়া চাষের আয়

বৃদ্ধি করে। এই সকল হইল কৃষিজীবীর উপযুক্ত উপশিল্প। কৃষক-পরিবারে বৎসরের সকল সময় কাজ থাকে না। এই সময়ে উপশিল্প দ্বারা কিছু আয় হইলে উহাদের আর্থিক মঙ্গল হয়। নানারূপ শিল্পও ইহাদের উপযোগী, যেমন সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন।

এই রকমের নানা কাজ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন। জাপান যে সস্তাদরে কত রকমের জিনিষ, রেশম ও সুতার কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া খেলনা পর্য্যন্ত কত কি দিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, ইহার অধিকাংশই কুটীরশিল্প দ্বারা উৎপন্ন।

চাষের প্রধান সহায় গরুর সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত উদাসীন। আমাদের দেশের গরু আধ সের বা একসের দুধ দেয়, বিলাতে দেয় আধ মণ। আমরা এক পাল গরু রাখি, কিন্তু তাহাদের খাদ্যের অভাব। বাঙ্গালার কোথাও গরু ইত্যাদির খাদ্যের জন্য কোনও রূপ ফসল জন্মান হয় না। ভাল গরু পালন করিতে হইলে তাহার ভাল খাদ্যের প্রয়োজন। অল্প পরিমাণ স্থানের মধ্যেই বের্‌সিম্ ইত্যাদি অতি পুষ্টিকর খাদ্য জন্মাইতে পারা যায়। গরুর সম্বন্ধে এই উদাসীনতার কারণ হইতেছে অজ্ঞতা, যাহা কেবল শিক্ষা দ্বারাই দূর হইতে পারে।

কেবল বাঙ্গালা দেশেই গরুর অত্যন্ত অনাদর। বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই এবং ব্রহ্মদেশে গরুর জন্য জওয়ার (দেবধান্য) ও মকা জন্মান হয়। প্রায় তিন মাসের মধ্যেই ফসল তৈয়ারি হয়। ডাঁটা পাতা ইত্যাদি সমস্ত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া মাটির ভিতর গর্ত্তে রাখিয়া দিলে ইহা অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত হয়। দরকার মত অল্প অল্প বাহির করিয়া খাওয়ান যায়। এইরূপ খাদ্যের প্রচলন বিশেষ আবশ্যক। ধানের খড়ে বা বিচালীতে পুষ্টিকর অংশ অতি কম।

উন্নত প্রণালী, উন্নত বীজ, উন্নত সারেরও প্রয়োজন। মূল ভিত্তি হইতেছে সমবায় বা সহযোগ। শিক্ষা দ্বারা ইহা গড়িয়া তুলিতে পারিলে অপর প্রয়োজনগুলি আয়ত্ত করা অতীব সহজ-সাধ্য হইবে।

সমবায়

ফরিদপুর জেলার সেটল্‌মেণ্টের সময় শ্রীযুক্ত জ্যাক্ সাহেব সমস্ত জেলার লোকের আর্থিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি "The Economic Life of a Bengal District" নাম দিয়া এই সংগৃহীত তথ্য সম্বন্ধে এক উপাদেয় পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই জেলার সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যেক একশতের মধ্যে সাতাত্তর জন কৃষিজীবী এবং মাত্র তেইশ জন অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে। অধিবাসীদের প্রায় অর্দ্ধেকের মোটা ভাতকাপড়ে সচ্ছল অবস্থা, ঋণ না করিয়া চলে। অপর অর্দ্ধেকের অবস্থা অসচ্ছল, ঋণ না করিয়া চলে না। ঋণের সুদের পরিমাণ একশত টাকার উপর বৎসরে ছত্রিশ টাকা হইতে আটচল্লিশ টাকা। এই সুদ বৎসরের শেষে এবং কোন কোন স্থলে ছয় মাসের পর আসলে পরিণত হয়। অতএব সামান্য মাত্র ধার করিতে বাধ্য হইলে এবং অসচ্ছলতা হেতু সময়মত আসল ও সুদ শোধ দিতে না পারিলে অল্পদিনেই ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং ঋণজাল হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালার সকল স্থানেই এই অবস্থা। কৃষির বিষয় আলোচনা করিবার সময় দেখাইয়াছি যে, অধিকাংশ লোকেরই কখনও-না-কখনও ঋণের প্রয়োজন হইবেই হইবে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া কৃষককুল ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে।

এই ঋণসমস্যা সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট সমবায় সমিতি স্থাপন করিতেছেন এবং আইন করিয়া সমবায় সমিতি গঠনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সমবায়নীতি শিক্ষা দিবার জন্য লোকের অভাব। এই সম্বন্ধে জ্যাক্ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা দেশের লোকের বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়। মোটামুটি তাঁহার কথা এই—এক ফরিদপুর জেলাতেই সমবায়-প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে এমন দুইশত কুশলী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন যাহারা লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে। নিরক্ষর লোকদিগকে সমবায়নীতি শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ইহার কার্য্য দেখান প্রয়োজন। শুধু উপদেশ দ্বারা হইবে না। এখন গবর্ণমেণ্ট প্রতি জেলায় মাত্র একটি কি দুইটি কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। কখনও যে যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। অতএব কতশত বৎসরে যে ঋণ-সমস্যার সমাধান হইবে তাহা বলা যায় না। দেশবাসিগণ এই অতীব হিতকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে অতি অল্পদিনেই ইহা কার্য্যকর হইতে পারে। বক্তৃতা দিয়া বা পুস্তিকা ছাপাইয়া এ-কাজ হয় না।

যাহার নিকট হইতে আদায় হইবার আশা কম তাহাকে কেহ টাকা ধারে দিতে চায় না। তাহার জন্য অবস্থাপন্ন কেহ যদি জামিন হয় তবেই তাহার পক্ষে ধার পাওয়া সম্ভব হয়। সমবায়-ঋণ-সমিতিতেও এই জামিনের ব্যবস্থা। দশজন মিলিয়া দশজনই যদি সকলের ঋণের জন্য সমান দায়ী হয় তাহা হইলেই লোকে সাহস করিয়া কম সুদেই টাকা ধার দেয়। এইরূপ অনেকে মিলিয়া যদি সমিতি গঠন করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বল্প সঞ্চয় এই সমিতিতে গচ্ছিত রাখে, তাহা হইলে এই গচ্ছিত সঞ্চয় হইতেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা

হইয়া যায়। যতদিন গচ্ছিত সঞ্চয় ঋণদানের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, আইন দ্বারা এমন ব্যবস্থা হইয়াছে যে, এই সমিতি অল্প সুদে ঋণ পাইতে পারে। ইটালি প্রভৃতি দেশে কৃষকদেরই গচ্ছিত টাকা হইতে প্রয়োজনীয় এই সমস্ত ঋণের টাকা সংগৃহীত হয়। কৃষকেরা গচ্ছিত টাকার সুদ ত পায়ই এবং দরকার হইলে অল্প সুদে ধারও পায়।

কেবল ঋণ পাইবার জন্যই যে সমবায়নীতি অবলম্বন করা হয় তাহা নহে। কোন জিনিষ যদি আমার আধসের, একপোয়া দরকার হয় তাহার জন্য আমাকে যে দাম দিতে হয়, যদি অনেকে মিলিয়া একেবারে এক মণ দুই মণ কিনিয়া যাহার যেরূপ প্রয়োজন ভাগ করিয়া লই তাহা হইলে দাম সস্তা হয়। অতএব যাহাতে সমবায়ে ক্রয়সমিতি করা যায় সেইরূপ সমবায়ে উৎপন্ন দ্রব্য-বিক্রয় সমিতি করা যায়। যদি অনেকে মিলিয়া একবারে প্রচুর পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় করা যায়, বড় ব্যবসাদার তাহা ক্রয় করিবে। এই রূপ সমবায়ে ক্রয়বিক্রয়ে ছোট ছোট পাইকারী দোকানদার যে-লাভ করে সে-লাভের পরিমাণ ক্রেতা-বিক্রেতার হাতেই থাকে।

সমবায়নীতি শিক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ক্রমেই নানা হিতকর পন্থা বাহির হইয়া পড়ে। কৃষির উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি সমবায়ে খরিদ করা যায়; কৃষির স্তম্ভ যে বলদ তাহার জীবন বীমা করা যায়। বলদ মরিয়া গেলে কৃষক অল্প খরচেই পুনরায় বলদ পাইতে পারে। সমবায়ে বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, পুষ্করিণী, স্কুল, হাসপাতাল, সমস্ত কিছুরই সুবিধামত বন্দোবস্ত করা যায়।

সমবায়নীতি দ্বারা কি উপকার হয় তাহার বর্ণনায় এক ফরাসী কৃষক যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমি দরিদ্র ছিলাম এবং ঋণ পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। তার পর এক সমবায় সমিতিতে যোগদান করিয়া নানা বিষয়ে অনেক লাভ করিতে সমর্থ হই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ছেষট্টি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া দুইটা বাছুর কিনিয়া পালন করিয়া দুইশত টাকায় বিক্রয় করি। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে একশত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া এক শূকরী কিনি এবং তাহার বাচ্ছা বিক্রয় করিয়া একশত চৌত্রিশ টাকা পাই; শূকরী আমারই থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চাষের জন্য এক ঘোটকী ভাড়া করিতে হয় (বিলাতে ঘোড়া দ্বারা লাঙ্গল চালান হয়) তখন আমার মাত্র দুই শত টাকা ছিল। তাহাতে এক বৃদ্ধ ঘোটক পাইতাম। ঋণ গ্রহণ করিয়া তিনশত পঁচাত্তর টাকায় এক বাচ্ছা ঘোটকী কিনি এবং দুই বৎসর ব্যবহার করিয়া তাহাকে ছয়শত টাকায় বিক্রয় করি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সোয়াশত টাকা ঋণ লইয়া এক গাভী কিনি। দুইটি বাচ্ছা পাই এবং গর্ভাবস্থায় ঐ গাভী বিক্রয় করিয়া দুইশত বিশ টাকা পাই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমার এক গাভীর গর্ভস্রাব হওয়ায় অতি অল্প দুধ দিতে থাকে। দুইশত টাকা ঋণ করিয়া অপর এক গাভী কিনিয়া সারা শীতকাল তাহার দুধ বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একশত ত্রিশ টাকা ধার করিয়া জমিতে উত্তমরূপে সার দিই এবং অতি উত্তম ফসল পাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে খাজনা দিবার জন্য দুইশত টাকা ঋণ গ্রহণ করি, তাহা না হইলে আমার ঘোটকীটি বিক্রয় করিতে হইত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে একশত ষাট টাকা ছয় মাসের জন্য কর্জ লইয়া বারটি ভেড়া কিনি এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেইগুলি বিক্রয় করিয়া দুইশ সত্তর টাকা পাই। তাহাদিগকে চারিমাস রাখিতে আমার পঞ্চাশত টাকা খরচ হয়;

অতএব চারিমাসে আমার ষাট টাকা লাভ হয়। তা ছাড়া ঐ ঋণের টাকা আরও দুই মাস খাটাই।"

কিছুদিন পূর্ব্বে টেভয় হইতে জাহাজে চড়িয়া রেঙ্গুনে আসিতেছিলাম। রেঙ্গুনের বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টার মিষ্টার এ, সি, মার্টিন্‌ও আসিতেছিলেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে ওভারসিয়ারী পাশ করিয়া ব্রহ্মদেশে চাকুরী লইয়া আসেন। পরে কোন অসুবিধাবশতঃ চাকুরি ছাড়িতে বাধ্য হন। এখন তিনি নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টার দ্বারা ধনী হইয়াছেন। তিনি নানারূপ খনির প্রতিষ্ঠাতা ও অংশীদার; তাহা ছাড়া ব্রহ্মদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কণ্ট্রাক্টার। তিনি ইহুদী জাতীয় এবং তাঁহার নিবাস পারস্য দেশে। আমার সহিত আলাপের সময় তিনি বলিলেন, "আমি বাঙ্গালা দেশকে বিশেষ জানি। পল্লীগ্রামের অতি শোচনীয় হীন কুটীরগুলি দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হয়। সকলে মিলিয়া যদি ঘর বানায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সকলের পাকা বাড়ী হইয়া যাইতে পারে।" মনে মনে বলিলাম যদি দেশ এরূপ সুবুদ্ধি চালিতই হইত তাহা হইলে এমন দুর্দ্দিন কেন উপস্থিত হইবে। আরও মনে মনে বলিলাম, আপনি পর হইলেও আপনার মনে কষ্ট হয়, কিন্তু আমি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী আমার আত্মীয়; আমার মন যে কত কাঁদে তাহা কাহাকে বলিব। আমাদের দরিদ্রে ও ভদ্রে তফাৎ বড় বেশী নাই। ব্রহ্মদেশে কুলী রমণীরা মাঠে ঘাস নিড়ায়; তাহাদের কত রঙ্গীন কাপড় ও সাদা ধব্‌ধবে জামা। সকলেই রঙ্গীন বস্ত্রের নীচে আর একটি নিকৃষ্ট বস্ত্র এবং সাদা জামার নীচে আর একটি নিকৃষ্ট জামা পরে; একসঙ্গে দুইটি জামা, দুইটি বস্ত্র ব্যবহার করে। দিনে জল কাদা ঘাঁটিয়া কাজ করিতেছে ময়লা কাপড় পরিয়া; কাজের শেষে

সন্ধ্যাবেলায় হাত পা ধুইয়া, মুখে পাউডার মাখিয়া, ভাল কাপড় পরিয়া, পায়ে জুতা দিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী যায়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। আর কাহাকেও সন্ধ্যার সময় কলিকাতার হাওড়ার পুলের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে অনুরোধ করি, যে-স্থান দিয়া আমাদের ভদ্রসন্তানেরা কর্ম্মশেষে বাড়ী ফিরেন। তিনি কি দেখিবেন—বিষাদের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তিনি যদি মফঃস্বলের কোন পল্লীগ্রামে যান, কি দেখিবেন? ভদ্রসন্তানেরও পরিধানে এক মলিন বস্ত্র, এবং চাদর নামক তদনুরূপ এক দ্বিতীয় বস্ত্র কাঁধে লম্বমান বা কোমরে জড়ান। গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই। তারপর দরিদ্রের অবস্থার ত কথাই নাই। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায় দিনে বা এইরূপ কোন দিনে দরিদ্রদের একসঙ্গে মিলন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের আর কিছু বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। লোহার, বাউরী, প্রভৃতি দিনমজুরেরাই কাঙ্গালী বিদায় লইতে আসে। পৌষ মাসের রাত্রি, কনকনে শীত; শিশু-সন্তানদের, যাহাদের লজ্জা নিবারণের জন্য কোনরূপ আবরণের প্রয়োজন নাই, সম্পূর্ণ নগ্নদেহ, হয়ত সমস্ত রাত্রিই খোলা মাঠে কাটাইয়াছে। ব্রহ্মদেশে যে-কোন উৎসব উপলক্ষে লোকসমাগম একটি দেখিবার জিনিষ। সকলেরই রঙ্গীন বস্ত্র, এই সব বস্ত্র প্রায়ই রেশমী, সাদা ধব্‌ধবে জামা, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের মুখে পাউডার লাগান, চুল পরিষ্কাররূপে ছাঁটা বা বাঁধা এবং অধিকাংশ স্থলেই ফুল দিয়া সাজান ও পায়ে জুতা। ছোটবড় সকল সমাগমেই, এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামেও, পূর্ব্ব হইতেই চা চুরুট ও খাবারের দোকান বসে। দেশের অবস্থা মনে হইলে প্রাণ হু হু করে।

খাদ্য-সমস্যা

যথোপযুক্ত খাদ্যই দৈহিক উন্নতির ভিত্তি এবং রোগের প্রতিষেধক। খাদ্য দ্বারা শরীর গঠিত ও পুষ্ট হয়। খাদ্য যদি বলকারক ও পুষ্টিকারক না হয় তাহা দ্বারা পেট বোঝাই করিলেও কোনই ফল হয় না। আবার শরীর সবল ও সুস্থ না হইলে মনও সবল এবং সুস্থ হইতে পারে না। মনের সুস্থতা ও সবলতার উপর সমস্ত উন্নতি নির্ভর করে। অতএব খাদ্যই উন্নতির প্রথম ভিত্তি।

বিদেশে থাকিবার সময় ব্রেজিলের এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। উত্তর আমেরিকার ভান্‌কুভার প্রদেশে অনেক শিখ গিয়া কাজকর্ম্ম করে। ভারতের এই প্রসিদ্ধ যোদ্ধজাতীয় বলবান শিখ কুলীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহারা পয়সা সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথোপযুক্ত খাদ্য খায় না বলিয়া অন্যান্য অনেক কুলীর সমান কাজ করিতে পারে না। তাঁহার অভিজ্ঞতায় যে-সকল কুলীকে তিনি শূকর-মাংস ও ভাত নিয়মিত জোগাইতেন তাহারা শিখদিগের অপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারিত। মোটর গাড়ী হইতে একটা উদাহরণ দিতেছি। যে-গাড়ীর ইঞ্জনের জোর বেশী, দ্রুত চলিতে পারে বা পাহাড়ে উঠিতে পারে, তাহার খাদ্য, অর্থাৎ পেট্রল, বেশী আবশ্যক হয়।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের খাদ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, প্রায় সকল জাতিরই কোন-না-কোন একটি জিনিষ প্রধান খাদ্য, যেমন আমাদের চাল (ভাত)। সম্ভবতঃ সহজলভ্য বলিয়াই প্রধান খাদ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, ও মান্দ্রাজে ধান জন্মে বলিয়া লোকের প্রধান খাদ্য চাল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে গম জন্মে বলিয়া লোকের প্রধান খাদ্য আটা। গুজরাট প্রভৃতি পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের লোকের প্রধান খাদ্য দেবধান্য (জোয়ার), বাজ্‌রা ইত্যাদি। বিহারের অনেক স্থলের প্রধান খাদ্য মকাই এবং আলুয়া (মিষ্টি আলু) ও সুথ্‌নী। প্রধান খাদ্যের সহিত কতকগুলি জিনিষ আনুষঙ্গিক রূপে খাই, যথা—তরকারী, ডাল, শাক্‌সব্জী, ফলমূল, লবণ, দুগ্ধ, দই, ছানা, ঘৃত, সন্দেশ, মাংস, মৎস্য। আনুষঙ্গিক খাদ্যেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আছে। তাহারা যে-সকল উপাদান শরীরের জন্য সরবরাহ করে তাহা হয়ত অতি অল্প। কিন্তু এই অতি অল্প পরিমাণ উপাদানের অভাবে পুষ্টির ব্যাঘাত হয়, এবং নানা রোগের উৎপত্তি হয়। দেখা গিয়াছে, বহুদিন ধরিয়া কেবল মাংস ও রুটি খাইলে নাবিকদের এবং যুদ্ধের সময় সৈন্যদের চর্ম্মরোগ হয়। আবার শাকসব্জী বা লেবুর রস খাইলে সারিয়া যায়। আমাদের দেশে যে আজকাল বেরী বেরী রোগ প্রবল হইয়াছে ইহাও এইরূপ খাদ্যের কোন কোন উপাদানের অভাবে। জাপানে ও চীনে এক রকম শেওলা জাতীয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ আনুষঙ্গিক খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। অভিজ্ঞদের মত এই যে, ইহার ফলে দাঁত ও চুল বেশ ভাল থাকে। সহজে দাঁত পড়িয়া যায় না ও মাথায় টাক পড়ে না।

আজকাল খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হইতেছে। ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য চাল, গম, জনার এবং বাজ্‌রা লইয়া যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিতেছি। ইঁদুরকে খাওয়াইয়া পরীক্ষা করা হয়। দেড় মাস বয়স্ক বাচ্চা ইঁদুর

লইয়া ছয়টি ছয়টি করিয়া এমন ভাবে দল গঠন করা হয় যে, সব দলের ওজন সমান। সব দলকে একই ঘরে, একই অবস্থায়, এবং সমান যত্নে রাখা হয়। সব দলেরই ইঁদুরই যত পারিল নিম্নলিখিত রূপে তৈয়ারী খাদ্য খাইল। এই খাদ্যটিকে সকল দলের 'সাধারণ' খাদ্য বলিব।

মাংসের পরিত্যক্ত অংশ, যথা, চর্ব্বি, চামড়ার টুক্‌রা, ইত্যাদি কিন্তু মাংস নয়	২০ ভাগ
রিফাইন করা শর্করা জাতীয় খাদ্য (অনেকটা ধোয়া ভাত বা সাদা ময়দার মত)	৬০ ,,
তৈল (জলপাই)	৮ ,,
লবণ	৫ ,,
জল	যত খাইতে পারিল।

একদলকে কেবল এই সাধারণ খাদ্য ছাড়া আর কিছু দেওয়া হইল না। তাহাদের ওজন এবং আহার করিবার শক্তি কমিয়া গেল। বিয়াল্লিশ দিনের ভিতর ছয়টির মধ্যে পাঁচটি বেরী বেরী রোগে মারা গেল।

অপর এক দলকে 'সাধারণ' খাদ্যের উপর চাউল দেওয়া হইল। হাতে ধানের খোসা ছাড়াইয়া, হামান্ দিস্তায় পিষিয়া জল মিশাইয়া গুলি পাকাইয়া প্রত্যেককে প্রত্যহ খাওয়াইয়া তবে সাধারণ খাদ্য দেওয়া হইত। বিয়াল্লিশ দিনে এই দলেরও ওজন বাড়িল শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ।

যে দলকে সাধারণ খাদ্যের উপর জনার বাজ্‌রা দেওয়া হইল তাহাদের ওজন বাড়িল এই সময়ে শতকরা প্রায় একশত ছয় ভাগ।

যে-দলকে সাধারণ খাদ্যের উপর গম দেওয়া হইল (চালের মতই প্রস্তুত করিয়া) তাহাদের ওজন বাড়িল এই সময়ে শতকরা একশত একচল্লিশ ভাগ।

পরীক্ষাতে সকলকেই সমান ওজনের চাল, জনার, বাজ্‌রা ও গম দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, গম চাল অপেক্ষা দ্বিগুণ পুষ্টিকর। চাল সর্ব্ব নিকৃষ্ট এবং জনার-বাজ্‌রা চাল ও গমের মাঝামাঝি। এই ইঁদুরগুলিকে হাত দিয়া খোসা ছাড়াইয়া যে-চাল দেওয়া হইয়াছিল তাহার কোন অংশ নষ্ট হয় নাই। আমরা কি চাল খাই? প্রথমে একদফা ধানকে সিদ্ধ করিলাম। তাহার পর ভাত রাঁধিয়া সমস্ত ফেন ফেলিয়া দিলাম। এই ফেন ফেলিবার প্রথার দরুণ ভাত এত বেশি জলের সহিত রাঁধা হয় যে, ভাতের অধিকাংশ সারভাগই ধোয়া যায়। প্রায় ছিব্‌ড়েমাত্র যাহা বাকী থাকে তাহাই উদরসাৎ করি। পল্লীগ্রামে এখনও ঢেঁকীতে ধান ভানা হয়; ইহাতে চালের সমস্ত পুষ্টিকর অংশ বাদ যায় না। শহরবাসীরা খান কলে তৈয়ারি ছাঁটা ধব্‌ধবে চাল যাহার অধিকাংশ সারভাগ এইরূপে তৈয়ারির সময় বাদ্ যায় এবং যাহার ফেন ফেলিবার পর যাহা থাকে তাহা উপরোক্ত সাধারণ খাদ্যেরই প্রায় সমান। এই পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অপর এক দল ইঁদুরকে নিম্নলিখিত খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল—

যাঁতাভাঙা আটার রুটি, যাহাতে গমের সারভাগ প্রায় কিছুই নষ্ট হয় না। এই রুটিতে মাখন মাখাইয়া দেওয়া হইত। অঙ্কুর বাহির হইয়াছে এমন ছোলা, কলাই, দুধ, কাঁচা শাকসব্জী, এবং মাসে দুইবার মাংস দেওয়া হইত। বিয়াল্লিশ দিনে ইহাদের ওজন বাড়িল শতকরা দুইশত ভাগ।

এই পরীক্ষা হইতে উৎকৃষ্ট (good diet) এবং নিকৃষ্ট (bad or

(low diet) খাদ্য কি তাহা বেশ বোঝা যায়। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট খাদ্য, স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তির উপর কিরূপ কার্য্য করে তাহা আর একটি পরীক্ষার দ্বারা অতি সুন্দররূপে দেখা যায়। কতকগুলি প্রায় অর্দ্ধবয়স্ক ইঁদুর লইয়া দুইটি দল গঠন করা হয়। প্রত্যেক দলে বারটি পুরুষ এবং আটটি স্ত্রী-ইঁদুর রাখা হয়। দুইটি দলেরই ওজন সমান এবং দুই দলকেই একই অবস্থায় ও সমান যত্নে রাখা হয়।

প্রথম দলের খাদ্য নির্দ্দিষ্ট হয়,—মাখন মাখান যাঁতাভাঙ্গা আটার রুটি, অঙ্কুর হইয়াছে এমন ছোলা, কলাই, টাট্‌কা দুধ, কাঁচা শাক্‌সব্জী, কাঁচা ফল, (টমেটো বা বিলাতী বেগুন) এবং সপ্তাহে একবার তাজা মাংস। পঁচাত্তর দিনে ইহাদের ওজন শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বাড়িল। সকলেই বেশ সুস্থ ও খুব চট্‌পটে হইল। সকলেরই দেহ পুষ্ট ও লোম সুশ্রী ও মসৃণ হইল। ছয়মাসের মধ্যে মাত্র তিনটির মৃত্যু হইল। একটি গর্ভাবস্থায় পেটে আঘাত পাইয়া, একটি নিউমোনিয়া হইয়া, এবং তৃতীয়টির বাহ্যিক কোন পীড়ার লক্ষণ দেখা যায় নাই। অতএব মৃত্যুসংখ্যা শতকরা পনের হইলেও প্রকৃতপক্ষে দশ। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গেল তাহাদের শারীরযন্ত্র গঠনের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। ছয় মাসের মধ্যে এই দলের একশত পঁয়ত্রিশটি বাচ্চা হইল, বাচ্চাগুলি সবই নীরোগ, এবং বাঁচিয়া রহিল।

অপর দলের খাদ্য নির্দ্দিষ্ট হইল সাদা ময়দার পাঁউরুটি, বোরাসিক এসিড মিশ্রিত নারিকেল তৈল* এই রুটিতে মাখাইয়া তাহার উপর

---

* বাজারে আজকাল বানস্পতি ইত্যাদি মার্কা দেওয়া যে সকল ঘৃত বিক্রয় হয় তাহা এবং সস্তা টিনের মাখন, সবই নারিকেলতৈল জাতীয় এবং যাহাতে এই সকল দ্রব্য নষ্ট না হয় সেই জন্য ইহাদের সহিত বোরাসিক্ এসিড ইত্যাদি শোধক মিশাইয়া দেওয়া হয়।

যথেষ্ট পরিমাণ বাজারে ক্রীত টিনের জ্যাম দেওয়া হইল। দুধ ও চিনি দিয়া সাধারণ প্রণালীতে প্রস্তুত চা, টিনে আমদানী করা মাংস এবং লবণ ও সামান্য সোডা দিয়া সিদ্ধ বাঁধাকপি গাজর আলু ইত্যাদি।

এই দলের ওজন দ্রুতগতিতে কমিয়া গেল। সকলেই নিস্তেজ ও স্ফূর্তিহীন হইল; দেহ শীর্ণ ও লোম বিশ্রী হইয়া গেল। সত্তর দিনের মধ্যেই ছয়টির এবং ছয়মাসের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টির মৃত্যু হইল। অতএব মৃত্যুর হার শতকরা পঁয়তাল্লিশ। মৃত্যুর কারণ,—তিনটিকে অপর সকলে মিলিয়া মারিয়া খাইয়া ফেলিল। অন্যান্য গুলিকেও এইরূপে মারিয়া খাইয়া ফেলিতে পারে এই ভয়ে কয়েকদিন রাত্রে সকলকে আলাদা আলাদা খাঁচায় রাখা হইল; এবং তাজা শাকসব্জী খাওয়ানর পর হিংসার ভাব নিবারিত করিয়া পুনরায় রাত্রে একসঙ্গে রাখা হইল। অপর ছয়টির মৃত্যুর কারণ ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া। ইহাদের ফুসফুস এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, অতি সামান্য কারণেই রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। এই সময় আরও বহু ইঁদুর ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই রোগ ছিল না। শবব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গেল যে, সকলেরই পাকস্থলী এত বিকৃত হইয়াছে যে, খাদ্য হজম করিবার শক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে। পরিপাকনালীর কোন স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে, কোন স্থান অতি শীর্ণ হইয়াছে। বিষ্ঠা গুটুলী আকারে নালী বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, গুটুলী-গুলি মালার আকারে নালীর মধ্যে সাজান রহিয়াছে। পরীক্ষার প্রথম সময়ে এই দলের মাত্র দুইটির এগারটি বাচ্চা হয়; বাচ্চাদের মধ্যে দুইটি মরিয়া যায় এবং নয়টিকে ইঁদুরেরা খাইয়া ফেলে।

টিনের মাছ, মাংস, মাখন ইত্যাদিতে যে শোধক ব্যবহার করা হয় তাহা পাকস্থলীর বেশি অনিষ্ট করে বলিয়া বোধ হয়।

এই ত গেল পরীক্ষার ফল। এ স্থলে মনে রাখা উচিত যে, ক্ষুদ্র

ইঁদুরে খাদ্যের গুণাগুণের ফল অতি শীঘ্র দেখা যায় এবং মানুষে এই ফল দেখা দিতে সময় লাগে। এখন আমাদেরই দেশে যাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ খাদ্য খায় তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? আমি দ্বারবঙ্গ জেলায় পনর বৎসর ছিলাম। এখানে সাধারণ কুলীমজুর-শ্রেণীর প্রধান খাদ্য আলুয়া, সুথ্‌নী, যাহাতে শরীর গঠন এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান অল্পই আছে। আমার জানিত ছয় জন এই শ্রেণীর যুবক পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যতীক্রমে অজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া দেখা দিবার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যায়। এখানে এই অসুখ অতি সাধারণ। যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাব বা low diet-ই ইহার মুখ্য কারণ। আমাদের, বিশেষ করিয়া শহরবাসীদের, অজীর্ণ, অম্ল, ডিসপেপ্‌সিয়া এবং ফুস্‌ফুসের রোগাধিক্যের প্রধান কারণও ইহাই। উপরোক্ত পরীক্ষার দ্বারা যে খাদ্য উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা শিখজাতির খাদ্য। শিখদিগের উন্নত, পুষ্ট ও সবল দেহ এবং শক্তি ও সাহসের কথা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষের জলহাওয়াতে এই খাদ্য যে সকলের পক্ষেই উপযোগী তাহা বিশেষজ্ঞেরা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ম্যাক্‌ফারসন্‌ সাহেব বলেন; পৃথিবীর সকল জাতির পক্ষেই ইহা উপযোগী।

বাঁকুড়া জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে আমার জন্ম। এই গ্রামের বাসিন্দা মাত্র দুইঘর ব্রাহ্মণ, ঘর চারি-পাঁচ কায়স্থ, বহুঘর কৃষিজীবী সদ্গোপ, কয়েক ঘর লোহার এবং বহুঘর বাউরী। সমাজের স্তর-হিসাবে এই বিভাগ হইল উপর হইতে নীচে। কিন্তু যদি শারীরিক পুষ্টি ও সবলতা ধরিয়া বিভাগ করা যায় তাহা হইলে প্রথমে বাউরী, লোহার, তার নীচে সদ্গোপ ও সর্ব্বনিম্নে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের স্থান। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এইরূপ। আমি সমস্ত শ্রেণীকে ধরিয়া সাধারণ

ভাবে এই কথা বলিতেছি। কোন শ্রেণীতে কেহ কেহ পালোয়ান হইতে পারে, তাহা ধরিতেছি না। এইরূপ হওয়ার কারণ হইতেছে বাউরী লোহারেরা অভাববশতঃ ভাতের ফেন ফেলিতে পারে না, ফেনও খায়। ইহারা প্রায়ই ভাতের সঙ্গে ডাল পায় না, কিন্তু মাছ, শামুক প্রভৃতি এবং নানারকম শাকসব্জী জোগাড় করিয়া খায়—যাহা উচ্চ শ্রেণীর লোকে জঙ্গলী বা অসভ্য খাদ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে। ইহা ছাড়া মাঠে কাজ করিতে করিতে কাঁচা বেগুন, ঢেঁড়স ও অন্যান্য কাঁচা-পাকা ফল দুই-একটা প্রত্যহই খায়। চীনা জাপানীরা ভাত খাইয়াই এত বলবান। তাহারা কখনও ভাতের ফেন ফেলে না। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে ভাতের ছিবড়া খায় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ডাল পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী ডাল খায় কতটুকু। ডালের ঝোল করিয়া সেই জল ভাতে মাখে যাহাতে ভাত সহজে গলা পার হয়। সাদা ময়দার ফুল্‌কো লুচি, বেগুন ভাজা, সাদা ময়দারই গজা প্রভৃতি সন্দেশ সভ্য খাদ্য হইতে পারে কিন্তু শরীরগঠনে ইহাদের উপকারিতা অতি অল্প। ভারতবর্ষের যাহারাই ভাল রুটি খায় তাহাদেরই দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। বাঙ্গালীর রুচি এতই বিকৃত হইয়াছে যে, যদিও কখনও বাঙ্গালী, বিশেষতঃ শহরবাসী অতএব সভ্য বাঙ্গালী, গম খায় তাহা সাদা ধবধবে ময়দা, যাহা হইতে গমের যাহা-কিছু সারবস্তু বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। কেবল বাঙ্গালা দেশেই এই সাদা ময়দার চলন। গম যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহাদের নিকট ময়দা পরিত্যাজ্য, দুই চোখের বিষ।

খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে কোন কোনটির অভাব থাকিলে মানুষের শরীরের গঠন ও বাড়ন এবং স্বাস্থ্যের কিরূপ ব্যাঘাত হয় আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশের দুইটি জাতির বিবরণ হইতে তাহা

বেশ বুঝা যায়। ইংলণ্ডের খাদ্যানুসন্ধানসমিতি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

কিকুয়ু জাতির খাদ্য প্রধানতঃ জনার, ভুট্টা, কলাই, কন্দ (মিষ্ট আলু, মূলা প্রভৃতি) ও কলা। ইহার উপর প্রায় সকল স্ত্রীলোকই পদিনা, রাই, লেটুস্ প্রভৃতির ন্যায় কাঁচা পাতা এবং একপ্রকার মাটি খায়। শিশুরাও প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মাটি খায়।

মাসাই জাতির প্রধান খাদ্য মাংস, দুধ ও রক্ত এবং সামান্য ফল ও জনার ভুট্টা। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা কিকুয়ু স্ত্রীলোকদিগের মত কাঁচা পাতা ইত্যাদিও খায়।

মাপিয়া দেখা গিয়াছে মাসাই পুরুষেরা কিকুয়ু পুরুষ অপেক্ষা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি বেশি লম্বা এবং ওজনে প্রায় বার সের বেশি ভারি। মাসাই স্ত্রীলোকেরা কিকুয়ু স্ত্রীলোক অপেক্ষা প্রায় তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা এবং ওজনে প্রায় চৌদ্দ সের বেশি ভারি। মাসাইদের বক্ষঃস্থল চওড়া এবং কোমর সরু। হাতের জোর মাপ করিয়া দেখা গিয়াছে মাসাই পুরুষেরা কিকুয়ু পুরুষ অপেক্ষা ত্রিশ পাউণ্ড বেশি জোর দিতে পারে। মাসাই স্ত্রীলোকদিগের হাতের জোর কিকুয়ু পুরুষদিগের হাতের জোরের সমান এবং কিকুয়ু স্ত্রীলোকদিগের হাতের জোর ইহা অপেক্ষা দশ পাউণ্ড কম। দুই জাতির মধ্যে বিভিন্ন রোগের প্রাধান্য দেখা যায়। কিকুয়ু শিশু ও বালকবালিকাদের হাড় তেমন পুষ্ট নয়। ইহারা এই কারণে রিকেটস্ নামক রোগ এবং দাঁতের অপুষ্টতা ও শরীরে রক্তহীনতা (anæmia) হইতে কষ্ট পায়। মাসাই শিশু ও বালকবালিকাদের এই সকল রোগ প্রায়ই দেখা যায় না। বয়স্ক কিকুয়ুদিগের মধ্যে কাশ, ক্ষয়কাশ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং ঘা ফোঁড়া খুব বেশি এবং বয়স্ক মাসাইদিগের মধ্যে

কোষ্ঠবদ্ধতা এবং পেটে বাত বেশি। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য পুরুষদের স্বাস্থ্য অপেক্ষা ভাল এবং তাহাদের রোগও কম হয়।

হাসপাতালে স্কুল প্রভৃতিতে এই দুই জাতির খাদ্য লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন, দুই জাতিরই বেশি কাঁচা পাতা খাওয়া এবং শিখ জাতির দুধ খাওয়া দরকার।

দুধ শিশু ও বালকবালিকাদের শরীরের গঠন ও বাড়নে খুব সাহায্য করে। স্কটল্যাণ্ডের সাতটি বড় শহরে শ্রমিকশ্রেণীর লোকদিগের খাদ্য অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাত মাসের মধ্যে যে সকল বালকবালিকাকে দুধ দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের শরীরের বাড়ন যাহাদিগকে দুধ দেওয়া হয় নাই এমন বালকবালিকাদের বাড়ন অপেক্ষা কুড়ি গুণ বেশি হয়। স্কটল্যাণ্ডবাসীদের সাধারণ খাদ্য মাংস ও রুটি।

স্কটল্যাণ্ডের কোন এক স্থানে এক সময়ে মেষাদি গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে মৃত্যুর হার খুব বেশি দেখা দেয়। ইহাদের চারণমাঠ পরীক্ষা করিয়া যে উপাদান কম দেখা গেল তাহা পূরণ করিবার জন্য কতকগুলি মেষকে তাহাদের সাধারণ খাদ্যের উপর ভুট্টা, লবণ (calcium salts) এবং কডলিভার তেল খাওয়াইয়া দেখা গেল, এক বৎসরের মধ্যেই ইহাদের মৃত্যুর হার শতকরা চল্লিশ করিয়া কমিয়া গিয়াছে এবং ইহাদের শতকরা দশটি করিয়া বেশি বাচ্চা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার এক স্থানে গো-মোহিষের চারণমাঠে ফস্‌ফরাসের অভাব পূরণ করিয়া এইরূপ ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, উড়িষ্যার উত্তরাংশে, বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, দাক্ষিণাত্যে এবং মান্দ্রাজের অনেক স্থানে কুষ্ঠরোগের প্রাধান্যের কারণ হইতেছে এই সকল স্থানের লোকের প্রধান খাদ্য

চালের কোন-না-কোন উপাদানের অভাব। ধান গাছ মাটি হইতে নানাবিধ পদার্থ টানিয়া লইয়া জন্মে ও বাড়ে। বহুকালাবধি এই সকল স্থানে পর পর কেবল ধানই উৎপন্ন হয়। ইহার দরুণ কোন কোন উপাদানের অভাব ঘটিয়াছে। মাটিতে উপযুক্ত সার দিয়া এই অভাব পূরণ করা প্রয়োজন। আনুষঙ্গিক খাদ্য দ্বারাও এই অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। মাটির এবং নানাবিধ খাদ্যের উপাদান লইয়া পরীক্ষা হইতেছে। এই পরীক্ষার ফলে সত্বরে প্রতিকার আশা করা যায়।

যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাবেই যে বাঙ্গালীর শরীর পুষ্ট, সবল, ও সুস্থ হইতে পারিতেছে না এবং এই দুর্ব্বলতার দরুণ, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কাশ প্রভৃতি রোগের প্রকোপ যে বাঙ্গালা দেশে বাড়িয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সঙ্গতিপন্ন লোকেরাও অজ্ঞতা হেতু এমন সব খাদ্য খান যাহা শরীরের গঠন ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়।

খাদ্য সম্বন্ধে এই সাধারণ তত্ত্বগুলি সকলেরই জানা দরকার,—প্রধান ও আনুষঙ্গিক সব খাদ্যের মধ্যেই আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় যে উপাদান আছে সেগুলিকে নষ্ট না করিয়া খাওয়া আবশ্যক। এই উপাদানগুলিকে ডাক্তারেরা ভিটামিন্ (vitamin) বলেন। তেলে বা ঘৃতে ভাজিলে, বা আগুনে পোড়াইলে এই উপাদান-গুলি নষ্ট হয়। যাহা না রাঁধিয়াও খাওয়া যায়, যেমন ফল মূল ইত্যাদি, তাহা না রাঁধাই ভাল। অন্যথা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল সমেত খাইলে সমস্ত উপাদানগুলি শরীরে যায়। ফেনসমেত ভাত, খিচুড়ী, শুক, ঝোল, এই জন্যই উপকারী।

সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্তন না করিয়া কোন্ খাদ্য শরীরগঠনের ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী তাহাই এখন বলিব।

জল খাবার

সাদা ময়দার লুচী কচুরী অপেক্ষা ভিজাইয়া অঙ্কুর হইয়াছে এরূপ ছোলা কলাই ও গুড় দিয়া মুড়ী ভাল। চালের প্রয়োজনীয় উপাদান সমস্তই প্রায় মুড়ীতে নষ্ট হয়, কিন্তু কলাই তাহা পূরণ করিয়া দেয়। মুড়ী অপেক্ষা দুধ ও গুড় বা চিনি দিয়া পরমান্ন অথবা ফেনসমেত ভাত ভাল। জাঁতা ভাঙ্গা রুটি খোসা বাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোকল সমেত আটার রুটি ও গুড় বা তরকারি ভাল জল খাবার। তাহার সঙ্গে সামর্থ্যে কুলাইলে, মাখন, দুধের সর, বা দই হইলে উত্তম। লুচী খাইতে ইচ্ছা হইলে ঐরূপ আটারই লুচী খাওয়া উচিত। চালিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোকল বাদ দিলে লুচী আরও ভাল হইবে কিন্তু উপকারিতা কমিয়া যাইবে। ময়দা একেবারেই পরিত্যজ্য, আজকাল বানস্পতি ইত্যাদি মার্কা যে সব উদ্ভিজ্জ ঘৃত বাজারে ঘৃত বলিয়া চলিয়াছে তাহাতে দুগ্ধজ ঘৃতের যে উপকারিতা তাহার অংশ মাত্রও নাই, ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপ ঘৃত দিয়া লুচী ভাজিয়া খাইলে মনকে বৃথা প্রবোধ দেওয়া হয় যে, ঘৃতপক্ক লুচী খাইতেছি। উপকারিতা কিছুমাত্র নাই, উপরন্তু পয়সা খরচ। ইহা অপেক্ষা সামান্য দুগ্ধজ ঘৃত দিয়া রুটি খাওয়ার উপকারিতা অনেক বেশী। ইহা ছাড়া ঘৃতপক্ক লুচী অপেক্ষা রুটি সহজে হজম হয় এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঘৃতে ভাজিলে আটার প্রয়োজনীয় উপাদান অনেক নষ্ট হয়।

আজকাল কাহারও কাহারও, বিশেষতঃ বিলাতী ভাবাপন্ন শহর-

বাসীদের জল খাবার হয় পাঁউরুটি, মাখন ও জ্যাম। এস্থলে তাঁহাদিগকে ইঁদুরের উপর উপরোক্ত পরীক্ষার কথা স্মরণ করিতে বলি। সাদা ময়দার পাঁউরুটি অপেক্ষা আটার রুটির উপকারিতা বহুগুণ বেশী। সস্তা দরের মাখন প্রায় সমস্তই উদ্ভিজ্জ এবং দুগ্ধজ মাখনের তুলনায় তাহার উপকারিতা নাই বলিলেই হয়। সামর্থ্য থাকিলে বিশুদ্ধ ড্যানিশ মাখন ব্যবহার করা উচিত। না হয় দুধের সর বা তাহা হইতে বাড়ীতে প্রস্তুত ননী, মাখন ব্যবহার করা উচিত। বাজারের দেশী তাজা মাখনও প্রায় সমস্তই উদ্ভিজ্জ মারগারিন প্রভৃতির সহিত ভেজাল দেওয়া। জ্যাম অপেক্ষা ঘরে গুড় ফুটাইয়া পুরু চিটা ব্যবহৃত হইলে ঢের বেশী উপকারী। চিনির পুরু সিরাপ করিয়া ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গুড় ইহাপেক্ষা বেশী উপকারী। উপরে বলিয়াছি বাজারের মাখন জ্যাম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত শোধক ঔষধ পাকস্থলীর পক্ষে অপকারক, এই সকল ব্যবহার না করাই ভাল; কিম্বা যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

মধ্যাহ্নের আহার

ফেন না ফেলিয়া ফেনসমেত আতপ চাউলের ভাত, তাহার সঙ্গে কেবল ডালের ঝোল নয়, যতটা সম্ভব ডাল, কোন-না-কোন শাকের তরকারী; কিছু মাছ এবং কোন কিছুর একটা অম্বল। ডাল খাওয়া চাই ও মাছও খাওয়া চাই; ছোট-বড় যেমন হউক। আমাদের দেশে সপ্তাহে একবার কি দুইবারের বেশি মাংস খাওয়া উচিত নয়। মাংস আমরা মাছ অপেক্ষা বেশি পরিমাণে খাই, মাছের মত দুই এক টুকরা খাইলে রোজ খাইলেও কোন দোষ নাই।

বাঙ্গালীরা সিদ্ধ চালেই অভ্যস্ত; এই অভ্যাসটি ত্যাগ করিতে

হইবে। আর ফেন ফেলিবার প্রথা এখনই ত্যাগ করিতে হইবে। ভাত অন্ন জলে এমন ভাবে রাঁধা উচিত যে, ফেন না ফেলিতে হয়। ইহার জন্য দস্তুর মত প্রচারকার্য্য আবশ্যক।

অনেক ডাক্তারের মত এই যে, গুদামজাত চালে এক প্রকার রোগ হয় এবং এই রুগ্ন চাল ব্যবহার বেরি বেরি রোগের এক কারণ। যাহা হউক তাজা চাল যে বহুদিন পূর্ব্বে প্রস্তুত ও গুদামজাত পুরাণ চাল অপেক্ষা উপকারী যে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

রাত্রের আহার

রাত্রের আহারের জন্য বাঙ্গালা দেশে আটার রুটি প্রচলিত হওয়া বিশেষ দরকার। ইহার জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক এবং যেখানে সম্ভব গমের চাষ হওয়াও প্রয়োজন। রুটির সহিত ডাল, যাহা-হোক একটা তরকারী এবং একটা চাটনী হইলেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপর মাছ মাংস হইলে ত খুবই ভাল। যতদিন না আটার চলন হয় ততদিন ফেনসমেত ভাত ও ডাল খাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। খিচুড়ী ভাত অপেক্ষা ভাল, তবে উত্তেজক মশলা যত দূর সম্ভব কম ব্যবহার করা উচিত।

এইরূপে আহারের বন্দোবস্তের উপর নিম্নলিখিত জিনিষগুলির প্রয়োজন। সময়োপযোগী কাঁচাপাকা ফল ব্যবহার নিতান্ত দরকার। কোন-না-কোন ফল প্রত্যহ ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অতি সহজে এবং বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামে বিনা খরচে ও অল্প চেষ্টায় এমন একটি ফল পাওয়া যাইতে পারে, এইটি হইতেছে টমাটো বা বিলাতি বেগুন। বাড়ীর পাশে অতি সহজে ইহা উৎপন্ন করা যায়। আট-দশটি গাছ হইলেই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

কাঁচাপাকা ফল নূন দিয়া না রাঁধিয়াই খাওয়া যায়। প্রত্যহ একটি করিয়া খাইলেই যথেষ্ট। কাঁচা শাকসব্জী সামান্য পরিমাণে ব্যবহারের বিশেষ উপকারিতা আছে। পুদিনা শাক কাঁচা ব্যবহার করা যায়। পঞ্জাববাসীরা রাই শাক খুব ব্যবহার করে। সাহেবেরা সালাড্, লেটুস্ ব্যবহার করে। আমেরিকায় এই সকল বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। কোথাও কোথাও অনেকে ধনে শাক খায়। বাড়ীর পাশে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে, এই সমস্তই অতি সহজে উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

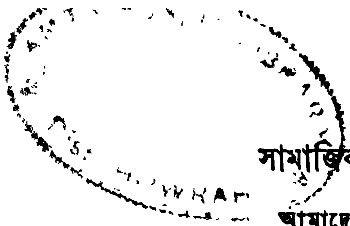
অতএব মোটামুটি খাদ্য হইল তাজা আতপ চালের ফেন সমেত ভাত, ডাল, শাকসব্জীর তরকারী, মাছ, কাঁচা ফল, ও কাঁচাশাক। গরু মহিষের দুধের ঘৃত দিয়া আটার রুটি। ইহা হইলেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট হইল। উপরন্ত যদি প্রত্যহ কিছু দুধ, দই, বা ঘোল ব্যবহার করা যায়, খাদ্যের পক্ষে আর কিছুই বাকি থাকে না এবং প্রয়োজনও হয় না।

খাবার যদি এইরূপে বদলাইয়া ফেলিতে পারা যায়, তখন দেখা যাইবে আমরা যেরূপ রাশীকৃত ভাত খাই তাহার প্রয়োজন হইবে না। সারবস্তু ফেলিয়া ছিবড়া খাই বলিয়াই রাশীকৃত খাইতে হয়। চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশবাসীর খাদ্যের পরিমাণ দেখিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাঙ্গালীরা এখন যত ভাত খায় চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশীয়েরা তাহার অর্দ্ধেকের বেশী খায় না।

জাপানে কৃষকদের মধ্যে যব এবং চাল এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খিচুরীর মত ব্যবহার হয়। উন্নত শ্রেণীর মধ্যে ভাতেরই চলন। কোন স্থলেই ফেন ফেলা হয় না। খাবারের সঙ্গে মাছ, শামুক, মূলা প্রভৃতি এক-এক টুকরা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর

খাদ্য হইতেছে সরবিন্ নামক ডাল জাতীয় শস্যের দানা ভাজিয়া সিদ্ধ করিয়া এক রকম নরম মোলায়েম পিঠার মত জিনিষ, ইহা ঘরে ঘরে তৈয়ার করা হয় না, প্রত্যহ ব্যবসাদারেরা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে এবং সকলেই কিছু কিছু আহারের সময় ব্যবহার করে। জাপানী সৈনিকদের প্রধান খাদ্য হইতেছে প্রায় দুই ভাগ চাল এবং এক ভাগ গম এক সঙ্গে সিদ্ধ করা এবং ইহার সঙ্গে মাছ মাংস ইত্যাদি, তরকারী অল্প পরিমাণ, যেমন সকলে খায়।

ফরাসীদেশে একদিন এক কৃষি-পরীক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ও কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছিলাম। আহার হইল এক প্লেট গোটা মসুর সিদ্ধ এবং তাহার সঙ্গে এক টুকরা মাংস এবং একটু পনীর। ফরাসী জাতির মধ্যে মসুর কলাই খাদ্যরূপে বহু ব্যবহৃত হয়। ইতালীতে ফেনসমেত ভাতের প্রচলনের জন্য প্রচার চলিতেছে এবং ইহার সঙ্গে এক টুকরা মাংস।



সামাজিক সমস্যা

আমাদের নারী

গার্হস্থ্য জীবনে ভারতের নারী জগতে অতুলনীয়। ভারতবর্ষের লোক দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও গার্হস্থ্য সুখশান্তিতে ভাগ্যবান। অন্যত্র তাহা খুব কমই এরূপ দেখা যায়। বিলাতে এক বন্ধু পরিচয় দিলেন যে, তিনি যে গৃহস্থের বাড়ীতে আছেন, এক দিন ঐ গৃহস্থের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডাকের খাম লইয়া তর্কবিতর্ক হইতে হইতে স্বামী স্ত্রীকে খামখানির দাম দিলেন। বন্ধু তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'ভারতবাসীর চক্ষে ইহা অতীব বিসদৃশ; কারণ তাহারা মনে করে, স্বামী ও স্ত্রী অভিন্ন।' উত্তরে গৃহিণী বলিলেন যে, তাঁহার স্বামী যে-কোন দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অতএব আপন আপন বুঝিয়া রাখাই বিবেচনার কাজ। এই চিত্রের সহিত আমাদের দেশের ছোট-বড় যে-কোন গৃহস্থের তুলনা করুন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, লেডী অবলা বসু, পরোলোকগতা কৃষ্ণভামিনী দাস, সরোজনলিনী দত্ত প্রভৃতি মনস্বিনীরা আমাদেরই সময়ের গৃহস্থঘরের নারী শিক্ষার দ্বারা কি হইতে পারেন তাহারই উজ্জল দৃষ্টান্ত। একরূপ বলিতে গেলে আমাদের নারীমাত্রেই অশিক্ষিতা। শিক্ষিতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। শিক্ষার অভাবে আমাদের নারীর গুণাবলীর সম্যক বিকাশ না হইলেও স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারাই তাঁহারা বড় বড় গৃহস্থালী কিরূপ সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। নিজ নিজ জীবন গঠনে

নারীর হাত কতদূর তাহা প্রত্যেককেই অনুধাবন করিয়া দেখিতে বলি।

সমাজ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে পুরুষ অপেক্ষা নারীরই কার্য্য বেশি। নারীই সমাজের প্রধান অঙ্গ। শিক্ষার সাহায্যে এই অঙ্গ যদি কালের ও উন্নতির গতির সঙ্গে তাল রাখিতে না পারে এবং পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সমাজও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য ; তা পুরুষ যতই উন্নত হোক না কেন। কিন্তু এহেন নারীর শিক্ষার জন্য আমরা কি করি?—কিছুই না। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থকেও কন্যার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে দেখা যায় না। অথচ আমরা প্রত্যেক নারীতে যেরূপ চরিত্রের উচ্চতা ও মহত্ব আশা করি তাহা পৃথিবীর অপর কোথাও দেখা যায় না। ভারতনারীর চারিত্রিক মহত্ব ভারতের গৌরব। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতিরেকেও এই উচ্চ আদর্শ ও চরিত্ররক্ষার ক্ষমতা বহু শতাব্দী এবং বহু জীবনে অর্জ্জিত।

আমাদের নারীগণ অসহায় কেন? উত্তর—যেহেতু আমরা তাহাদিগকে অসহায় করিয়া রাখিয়াছি। সকল দেশেই স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল (weaker sex) বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শক্তি, সামর্থ্যে, বুদ্ধিতে, কার্য্যপটুতায় কোন বিষয়েই নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন নয়। সুবিধা পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার নারীগণ সকল বিষয়েই কার্য্য দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতেছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক যত দুর্ব্বল ও সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল এবং অসহায়, এমন আর কোথাও নয়। আজকাল আধুনিক সভ্য দেশে স্ত্রীলোকেরা সকল কাজই করিতেছে। কেরাণীগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া মোটর-চালক ও রাস্তার পাহারাওয়ালার কাজ পর্য্যন্ত। ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত সমানে কোদাল পাড়ে, গাড়ী

চালায়, জমি চষে এবং পুরুষ অপেক্ষা উত্তম ব্যবসা করে। অধিকাংশ বর্ম্মা-পুরুষ অমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল। বর্ম্মা-স্ত্রীলোকেরাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। ব্রহ্মদেশে তখন প্রথম আসিয়াছি; মেমিওতে তুঁতের ক্ষেতে অনেক পুরুষ ও স্ত্রী-কুলী কাজ করে। আমি অধিকতর পরিশ্রমের কাজে পুরুষদিগকে নিয়োগ করিতে বলায় স্ত্রীলোকেরা হাসিয়া উঠিল। বর্ম্মা স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়েই আপনাদিগকে পুরুষের সমকক্ষ বিবেচনা করে। ইহা কেবল সামাজিক প্রথা ও শিক্ষার গুণে। আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমরা দুর্ব্বল করিয়া রাখিতেই সতত যত্নবান। কাজেই তাহারা অসহায়। অপর দেশীয় স্ত্রীলোকেরা শিক্ষার গুণে নানা হিতকর কার্য্য করিতেছে। এইরূপ একটি কার্য্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মদেশে লেকৃতো পাহাড়ের উপর কারেণদিগের বাস। এই প্রদেশ জঙ্গলময় এবং এখানে যাওয়া-আসা কষ্টসাধ্য। কোন্ সুদূর ইটালী হইতে মিশনারীরা আসিয়া এখানে মিশন ও কন্‌ভেণ্ট খুলিয়াছেন। একবার কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে আমাকে সেখানে যাইতে হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক যুবক মিশনারী আসিয়া এই মিশন্ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন লোকেরা অতি অসভ্য ছিল এবং তাহাদের কোন লিখিত ভাষাও ছিল না। যাতায়াত তখন অপেক্ষাকৃত বহুগুণ কষ্টকর ছিল। তিনি ইংরেজী অক্ষর প্রচলন করিয়া লিখিত ভাষার সৃষ্টি করেন। এখন বালকদের জন্য নানা স্থানে স্কুল হইয়াছে। এই মিশনও এক বৃহৎ স্কুল চালাইতেছে। মিশনের সঙ্গে এক কন্‌ভেণ্ট আছে, সেখানে বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। যিনি প্রথম মিশন খোলেন তিনি এইখানেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন মিশনের পরিচালক তিন জন পুরুষ; তাঁহারাও ইটালী হইতে আসিয়াছেন, এবং

শুনিলাম তাঁহারাও এই কার্য্যেই জীবনপাত করিবেন। তাঁহাদের আহার দুই বেলা অতি মোটা চালের ভাত। বর্ষাকাল, কয়েক দিন ধরিয়া বাদলা হইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বার মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে খবর আসিল একজনের গুরুতর অসুখ হইয়াছে। পাদ্রিদের একজন তাহার জন্য ঔষধপত্র লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইয়া গেলেন। তিন দিন পরে ফিরিবেন। একদিন একজন তিন মাসের এক পীড়িত শিশু ও পঁচিশটি টাকা লইয়া উপস্থিত। শিশুর মাতাপিতা পরলোক গমন করিয়াছে; মৃত্যুকালে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব এই পঁচিশটি টাকা ও শিশুটিকে পাদ্রিদের হাতে দিয়া গিয়াছে। পাদ্রিরা শিশুটিকে গ্রহণ করিলেন, তাহাকে মানুষ করিবেন। এইরূপ শিশু মানুষ হইবে কন্‌ভেণ্টে। কন্‌ভেণ্টে এখন তিন জন নান (nun বা sister) বা সেবিকা আছেন। তাঁহারাও ইটালী হইতে আসিয়াছেন। একজন কনভেণ্টের কর্ত্রী মঠধারিণী (mother superior), তাঁহার বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল আসিয়াছেন; এইখানেই দেহপাত করিবেন। তিনি নিকটবর্ত্তী সমস্ত লোকের মাতৃস্বরূপিনী। অপর দুই জনের বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তাঁহাদেরও সেই একই ব্রত। কন্‌ভেণ্টে বালিকাদের এক বৃহৎ স্কুল আছে এবং অনেকগুলি নিঃসহায় বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। নিঃসহায় বালকদিগকে বড় হইলে মিশনে রাখা হয়। কন্‌ভেণ্ট মিশনের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। মিশন সর্ব্বদাই লোকদিগের হিতচিন্তা করে এবং নানা বিষয়ে সাহায্যের চেষ্টা করে। রেশম কীট প্রচলন উপলক্ষ্যে আমাকে এইস্থানে যাইতে হয়। প্রথমে কন্‌ভেণ্টের সেবিকারাই এই কার্য্য গ্রহণ করেন।

নারীদের কার্য্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এই কন্‌ভেণ্টের

পরিচয় দিলাম। এইরূপ কত কন্‌ভেণ্ট ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে আছে। আমার বলা উদ্দেশ্য যে, আমাদের নারীরাও শিক্ষা পাইলে এইরূপ কত কাজ করিতে পারেন। চাই শিক্ষা।

বালিকাদের শিক্ষার অভাবের অপকারিতার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখের 'সঞ্জীবনী'পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

"বর্দ্ধমান হইতে জনৈক উকীল তাঁহার কন্যা ও স্ত্রীসহ ভুবনেশ্বরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই সময় তাঁহার পাণ্ডা ঠাকুর দেখাইবার অজুহাতে তাঁহার কন্যাকে বাড়ী হইতে লইয়া যায়। তারপর সেই দুর্ব্বৃত্তের ও সেই কন্যার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অতঃপর ব্যাপারটা পুলিশের গোচরীভূত করা হয়। তাহারা এই সম্পর্কে জোর তদন্ত আরম্ভ করে, ফলে সম্বলপুর হইতে তাহারা বালিকাকে উদ্ধার করে। বালিকাটির বয়স পনর যোল বৎসর, দেখিতে অতি সুশ্রী। পুলিশ তাহাকে উদ্ধার করিলেও তাহার পিতামাতা তাহাকে ভুবনেশ্বরে রাখিয়াই চলিয়া আসেন। তখন বালিকার স্বামীকে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনিও এই সম্পর্কে তাঁহার কিছু করণীয় আছে বলিয়া মনে করেন না। তারপর এই বালিকার সমস্যা একটা বড় রকমের সমস্যায় পরিণত হয়। সেই সময় স্থানীয় জনৈক মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া বালিকার সম্মতি লইয়া তাহাকে আর্য্যসমাজের মতানুসারে বিবাহ করেন। বিধির এমনই বিধান যে, সম্প্রতি তিনিও নিতান্ত অতর্কিত ভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন কেহই উহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, এমতাবস্থায় সে কোথায় দাঁড়ায়, তাহাই বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ভুবনেশ্বরের জনৈক সাব-ইনস্পেক্টরের তত্ত্বাবধানে

বালিকা অবস্থান করিতেছে। আমরা আশা করি হিন্দুসমাজের কোন প্রতিষ্ঠান এই অসহায়া আশ্রয়হীনা কন্যাকে গ্রহণ করিবেন।"

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে রামায়ণ, কথকতা, কীর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; তাহা হইলেও পল্লীসমাজের বাঁধন এখনও আছে। যাহারা কার্য্যোপলক্ষে পল্লীসমাজ ছাড়িয়া শহরবাসী হইয়াছে তাহাদের উপর সমাজের বাঁধন অনেকটা ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। শহরে প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনে না। কন্যার শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষিতেরাও উদাসীন; কিন্তু ঘরে ঘরে আট আনা চারি আনা সংস্করণের নাটক-নভেলের ছড়াছড়ি। উপরোক্ত ঘটনা এই অবস্থার কুফলের দৃষ্টান্ত।

পিতা উকীল, অতএব আধুনিক হিসাবে শিক্ষিত. পতির কোন পরিচয় নাই। মাতাপিতার ও পতির বিবেচনার তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। ইংরেজ-রাজের চালিত যন্ত্রে তৈয়ারি হইয়া পিতা উকীল হইয়াছেন; পয়সা রোজগার করিতেছেন; ভুবনেশ্বরে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন। পতিও নিশ্চয় আজকালকার হিসাবে শিক্ষিত। আজকাল ইংরেজ-চালিত যন্ত্রে তৈয়ারি 'মানব' নামক জীব বা পদার্থই বেশি দেখা যায়; 'মানুষ' খুব কম। তাহা না হইলে আমাদের এমন অধোগতি হইবে কেন? পিতামাতা পতি তাহাকে গ্রহণ না করুন, তাহার একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত ত করিয়া দিতে পারিতেন। কালও যাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন, বিড়াল কুকুরের অপেক্ষাও আজ সে পরিত্যজ্য। নারীর মধ্যকার যে 'পশুপ্রবৃত্তি' তাহাকে কুপথে লইয়া গিয়াছে, পিতা, মাতা, পতির ব্যবহারও তদনুরূপ পশুপ্রবৃত্তির পরিচায়ক। কন্যাটির ব্যবহার অতীব দোষণীয়, কোন সমাজই মার্জ্জনা করে না। বিবাহিতা ভারতনারী, হিন্দুনারী

পদস্থ লোকের কন্যা—এরূপ ব্যবহার কেন করে? তাহার কারণ উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। শিক্ষা পাইলে এই নারীই সমাজের মঙ্গলকারিণী এবং পূজনীয়া হইবে। মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণের সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাক৷ যায় না; এখন যদি কোন মুসলমান যুবক এই সুশ্রী কন্যাকে সাদরে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবার লোক অনেক জুটিবে।

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে কত ক্ষুদ্রচিত্ত ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে এই ঘটনা তাহারও পরিচায়ক। সমাজ যদি সমাজের প্রধান অঙ্গ নারীর মূল্য না বোঝে এবং নারীরা সমাজ ত্যাগ করে, তবে সমাজেরই ক্ষতি এবং এই ক্ষতির জন্য সমাজ নিজেই দায়ী। ফলে হিন্দু কমিতেছে, মুসলমান বাড়িতেছে।

বিধবা

আজকাল প্রায়ই শুনা যায়, হিন্দুবিধবার অবস্থা অতি শোচনীয়। সকল হিন্দুবিধবার পক্ষে এ কথা সত্য নয়; অধিকাংশ স্থলে বিধবারাই প্রকৃতপক্ষে সংসারের কর্ত্রী এবং আজীবন সকলের পূজনীয়া।

তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের তুলনা হয় না। একবেলা আহার এবং বৎসরে চারিখানি কি ছয়খানি কাপড় তাঁহাদের যাবতীয় প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু তাঁহারা গৃহস্থের সকলের আহারপ্রদায়িনী; কেহ পীড়িত হইলে শুশ্রূষাকারিণী এবং সকলের উপর হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপিনী। আত্মীয়স্বজন থাকিলে তাঁহাদের সামান্য ভাত-কাপড়ের অভাব হয় না। আত্মীয়স্বজনের অভাবেও অনেকেই নিজের অন্নসংস্থান করিয়া লন। পল্লীগ্রামে কত অসহায়া বিধবাকে

ধান ভানিয়া প্রফুল্লচিত্তে জীবন যাপন করিতে দেখিয়াছি। অতি অল্প স্থলেই অন্নবস্ত্রের অভাব চরিত্রস্খলনের কারণ হয়। আর্থিক দুরবস্থার দরুণ স্থানে স্থানে যে বিধবাদেরও দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। বিধবা বিবাহের প্রচলন ইহার আংশিক প্রতিকার করিতে পারে। এই স্থলে স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দেবীর উক্তি উল্লেখ করিতেছি—

"যে সকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে চাহেন, তাঁহারা বিবাহ করুন; কিন্তু হিন্দুনারী বিবাহ-বন্ধনকে যেরূপ পবিত্র আদর্শে দেখিয়া থাকে তাহাতে আমার বিশ্বাস, যে সকল হিন্দু বিধবা স্বামীকে একবার ভালবাসিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহারা কখনই আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে না বা চাহিবে না।"

আমারও এই মত। আমাদের বিধবাদের অনেকেই বিধবাই থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির দেখাদেখি সমাজের অপর জাতিরাও নিজেদের মধ্যে বিধবাবিবাহ রহিত করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে বাউরী, হাড়ি প্রভৃতি ছাড়া আর কোন জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ-প্রথার প্রচলন নাই। আমি জানি সদ্গোপদের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে কন্যার অল্পতা হেতু পণ দিয়া কন্যা সংগ্রহ করিতে হয়। দেখিয়াছি আমারই গ্রামের কয়েকজন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ চার-পাঁচ বৎসরের বালিকা কন্যা বিবাহ করিল। কয়েক পরিবার লোপ পাইল। বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়।

বিধবাবিবাহ-প্রথার প্রচলন যে সমাজের মঙ্গলের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন তাহা অনেকেই মনে করেন। কিন্তু সমাজে চলন নাই, অতএব সমাজের ভয়। ইহার প্রকৃত উপায় হইতেছে সাহস করিয়া

যেখানে প্রয়োজন বিধবা বিবাহ দেওয়া এবং সকলের মত না হয় বিধবাবিবাহ-প্রচলনকারীদিগকে লইয়া নূতন সমাজ গঠন করা। সকল বিধবাই যে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা নহে। কিন্তু বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কি-না সে বিষয়ে পিতামাতারা নিজদিগকেই প্রশ্ন করিবেন, এবং নিজের মনে যে-উত্তর পান সেইমত কার্য্য করিবার সাহস করিলেই বিধবাবিবাহ-সমস্যার সমাধান হইবে।

একজন কায়স্থ পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী অনভিজ্ঞ হইলেও স্বাধীন কোন কার্য্যদ্বারা সচ্ছল অবস্থাপন্ন হন এবং কিছু সঞ্চয়ও করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান এক কন্যা। কলিকাতাতেই কন্যার বিবাহ দেন। বিপত্নীক হইয়া কন্যা-জামাতা লইয়া সুখেই থাকেন। কন্যার দুইটি পুত্রসন্তান হইবার পর জামাতার মৃত্যু হয়। কন্যার বয়স তখন আঠার-উনিশ বৎসর। একদিন বিধবা কন্যা দুই শিশুপুত্রের এবং বৃদ্ধ পিতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পল্লীস্থ এক অশিক্ষিত মুসলমান যুবকের সহিত গৃহত্যাগ করে এবং পিতা সন্ধান করিয়া কন্যাকে বাহির করিলেও সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করে। এ ঘটনাটি অবশ্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ কয়টা ঘটনা প্রকাশিত হয়? একটা দুইটা হইলেই হৈচৈ পড়িয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রতিকারের চিন্তা করেন কয়জন? যদি ঐ ব্যক্তি তাঁহার কন্যার পুনরায় বিবাহ দিতে পারিতেন তাহা হইলে এই দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখেই জীবনটা কাটিত।

সুদূর কোন পল্লীগ্রামের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এক গোয়ালা স্ত্রী-পুত্র ও এক কন্যা লইয়া সুখেই ছিল। কন্যাটি অল্প বয়সে বিধবা হয়। কলেরা হইয়া হঠাৎ এই ষোল-সতের

বৎসর বয়স্ক বিধবা কন্যা ছাড়া সংসারের অপর সকলেরই মৃত্যু হয়। গরু, মহিষ, জমী, বাড়ী, ইত্যাদি সকলই এই কন্যার হইল। কন্যাও পিতার ন্যায় দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিত। একদিন শুনিলাম সমস্ত ত্যাগ করিয়া সে এক গোয়ালা যুবকের সহিত পলায়ন করিয়াছে।

এইরূপ ঘটনা যে নিত্য কত ঘটিতেছে তাহার খবর কে রাখে? হিন্দুসমাজে এখন কড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ সমস্তের গুরুত্ব অনুভব করিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। এইরূপ কুল ও সমাজ ত্যাগ করা ছাড়া কত অবৈধ প্রণয় জানিয়া শুনিয়া ও না-জানার ভাণ করিয়া সমাজ প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া নীরব আছে।

সমাজের অবস্থা এরূপ যে, পুরুষ হাজার হীনচরিত্র হোক না কেন, সে সমাজে অচল নহে। কিন্তু নারীর কলঙ্কের কথামাত্রেই এবং কলঙ্ক সত্য না হইলেও সে পরিত্যাজ্য। অতি হীনচরিত্র পুরুষই ঢাক পিটাইয়া নারী-চরিত্রের কলঙ্ক জাহির করে। অনেকের মুখেই শুনা যায় যে, স্ত্রীলোককে গণ্ডীর মধ্যে না রাখিলেই তাহার চরিত্রস্খলনের সম্ভাবনা। যুক্তি দেখান হয় যে, তাহারা বেশ্যাবৃত্তি করে। কিন্তু মূর্খ তাহারা, বুঝে না যে, নারীর বেশ্যাবৃত্তি পুরুষেরই চরিত্রহীনতা প্রমাণ করে। তাহা না হইলে পুরুষই নারীর জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিত, নারী পুরুষের জন্য নয়। সতী শব্দের প্রকৃত অর্থ সচ্চরিত্রা। পুরুষ একাধিকবার বিবাহ করিলেও এবং স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহ করিলেও আমাদের সমাজ তাহাকে সচ্চরিত্র বলে, যতদিন না সে পরস্ত্রীগমন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সচ্চরিত্রতা নয়। একস্ত্রীত্ব এবং একপতিত্বই বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করে। বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিলেও যেমন তিনি সচ্চরিত্র, সেইরূপ বিধবার পুনরায় বিবাহ হইলেও যতদিন সে স্বামীরতা ততদিন সে সতী।

বিধবার একাদশী ইত্যাদির বিধান রহিয়াছে এবং ধরিয়া লই যে, বিধবা রক্তমাংসের শরীরধারিণী হইয়াও স্বাভাবিক সমস্ত বৃত্তি দমন করিয়া রাখিবে। অনেকেই রাখেন এবং রাখিতে পারিলেই ভাল। আমাদের সমাজে কন্যা হইয়া জন্মাইলেই তাহার এমনভাবে শিক্ষা আরম্ভ হয় যে, আট-দশ বৎসরের হইতে না হইতেই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ-জ্ঞানে সে পাকা হইয়া উঠে। অথচ চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে, এমন শিক্ষার একেবারেই অভাব। এ অবস্থায় বালবিধবার যদি পদস্খলন হয় তাহার জন্য সে তত দায়ী নয় যত দায়ী তাহার পিতামাতা ও সমাজ। কন্যার ভাল শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন এবং ভালমন্দ জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে, অন্ততঃ আঠার বৎসর বয়সের কম, বিবাহ হওয়াই উচিত নয়।

স্বাভাবিক নিয়ম হইতেছে যে, পুরুষ স্ত্রী সঙ্গ এবং স্ত্রী পুরুষ-সঙ্গ কামনা করে। ইহা ঈশ্বরের বিধান এবং যাবতীয় প্রাণীর পক্ষেই সমান। মানব বিবাহ-প্রথার প্রচলন করিয়া এই বিধান পবিত্র করিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকটা যৌনসম্বন্ধের উপর স্থাপিত। এই জন্যই বোধ হয় ঈশ্বর মানবের যৌনসম্বন্ধ চিরজীবনব্যাপী করিয়া দিয়াছেন। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রায় অপর সকল প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষসম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী। ইহা দ্বারাই মানবকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। উপরোক্ত যুবতী, বৃদ্ধ পিতা, এবং দুই শিশু পুত্রের ভালবাসা অপেক্ষা মুসলমান যুবকের ভালবাসা বেশি মনে করিয়াছে। হয়ত চিরজীবন এক প্রকার সুখেই কাটাইবে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বিধবার বিবাহ অপ্রচলন ঈশ্বরের বিধিবিরুদ্ধ। ইহার প্রচলন নিতান্ত আবশ্যক।

বিধবাদিগের জন্য যে বিবাহপ্রচলন অতীব প্রয়োজনীয় ইহা

সকলেই স্বীকার করেন। সামাজিক নীতির জন্যও যে ইহা প্রয়োজনীয় তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ইহা ছাড়া এই প্রথার অপ্রচলন হেতু আমাদের জাতির শক্তি আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবনা, আমার অভাবে আমার স্ত্রীর কি হইবে। জীবনের উন্নতির জন্য যে অসমসাহসিকতার প্রয়োজন তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। এখন আমরা যাহা নিশ্চিত তাহাই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চাই। অনিশ্চিত উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার চেষ্টায় বিরত থাকি। ইহার প্রতিকার হইতেছে বিধবাবিবাহপ্রচলন এবং নারীদেরও এমন শিক্ষা দেওয়া যে, তাহারা নিজের উপর নির্ভরশীল হয়।

১৯২৭ সালের ২৭শে জানুয়ারীর 'সঞ্জীবনী'তে বাঙ্গালী ও হিন্দু-বিধবাগণ সম্বন্ধে ইহা প্রকাশিত হয়—

"বাঙ্গালা দেশে বিধবা বিবাহ কচিৎ হয়, কিন্তু পঞ্জাবে এই আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক বিধবাবিবাহ আরম্ভ হয়। পঞ্জাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এদিকে বঙ্গদেশে হিন্দু-বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। তাহার মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুরা বিধবাবিবাহ করিবে না। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, দলে দলে পঞ্জাবীগণ বাঙ্গালী বিধবাদের বিবাহ করিতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ জাতি, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালী বিধবাবিবাহ করিতে নারাজ, তাই বিধবারা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বিদেশে বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিধাতার ইঙ্গিত নানারূপে দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী তথাপি নিদ্রিত।"

ইহার পর ছয়টি বিধবার পঞ্জাববাসীর সহিত বিবাহের বিবরণ দিয়া পনর হইতে একুশ বৎসর বয়স্কা আঠার জন বিবাহপ্রার্থিনী

বিধবার তালিকা দেওয়া হয়। ইহারা সকলেই ইংরেজী শিক্ষিতা এবং কেহ কেহ ম্যাট্রিকও পাশ। লাহোরের বিধবাবিবাহসহায়ক-সভাও ইহাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেছেন। এতদিনে আরও কত বিধবা না জানি বিদেশগামিনী হইয়াছে।

প্রথম প্রথম যখন এইরূপ সংবাদ পড়িতাম আত্মীয়বিয়োগজনিত দুঃখের ন্যায় দুঃখ অনুভূত হইত। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও বহু আলোচনা হইয়াছে। বঙ্গনারী বাঙ্গালীর গৃহস্বামিনী থাকিলেই সুশোভন হয়। সেইরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি বিদেশিনী বিবাহ করেন তাহাও আমি অশোভন মনে করা ছাড়া বঙ্গনারীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার বলিয়াই বিবেচনা করি। শিক্ষিতা বঙ্গনারী যদি বিদেশীর গৃহে যাইতে বাধ্য হন তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা চেষ্টা করিলেই ইহা নিবারণ করিতে পারি।

আজকাল নারীহরণ, বিশেষতঃ বিধবা নারীহরণ, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহা নিবারণের প্রকৃত উপায় হইতেছে কতক পরিমাণে বিধবাবিবাহপ্রচলন এবং বিশেষভাবে শিক্ষাদ্বারা স্বাবলম্বন ও আপন শক্তিতে বিশ্বাস সৃষ্টি।

কুমারী

অনেকে বলেন, কুমারী কন্যারই বিবাহ দেওয়া এক প্রকার দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিধবা কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করা এক প্রকার অসম্ভব কথাটা একেবারে অসত্য নহে, কিন্তু সমস্ত সমাজ সম্বন্ধে সত্য নহে। ইহার মূলে কতকটা আছে বিবাহে পণপ্রথা। পণপ্রথা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু অধিক বয়স্ক লোকদের সহিত অল্প বয়স্কা কুমারীদের বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। আবার

এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা কুমারী কন্যা কম; পণ দিয়া কন্যা ক্রয় করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের বিবাহ হয় না বা অধিক বয়সে হয়। এমন অবস্থায় বিধবাদের বিবাহ প্রচলন নিতান্ত আবশ্যক।

একদিকে পণপ্রথার জন্য মেয়ের বিবাহ দেওয়া কষ্টকর। অপর দিকে অনেক স্থলে যৌতুক প্রদানে সক্ষমতা-সত্ত্বেও উপযুক্ত অর্থাৎ উপার্জ্জনক্ষম পাত্র পাওয়া কঠিন হইতেছে। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের বাড়ীতে আজকাল অনেক বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা রহিয়াছে; উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিবাহ হইতেছে না। এক উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক সেদিন বলিলেন যে, তিনি তাঁহার কন্যাদের বিবাহ দিবেন না স্থির করিয়াছেন, কারণ পাত্র পাইতেছেন না: পঞ্চাশ-ষাট টাকা বেতনভোগী পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন কষ্টকর করা অপেক্ষা বিবাহ না দেওয়া ভাল। ইহা বুঝিলাম, কিন্তু এই কুমারীদের জীবনে ত একটি কাজ চাই। বিধবা সমস্যার ন্যায় কুমারী-সমস্যাও ক্রমেই কঠিনতর হইবে।

বিধবাদের বিবাহ প্রচলন হইলেও অনেক বিধবা অবিবাহিতাই থাকিবে এবং সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে অনেক কুমারীকেও অবিবাহিতা থাকিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যাহারা ভাগ্যক্রমে সংসারের গৃহিণী হইয়া থাকিবে তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা অসহায় তাহাদের কি হইবে? সকলের পক্ষেই এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাহা দ্বারা, যদি আবশ্যক হয়, জীবিকা-অর্জ্জন করিতে পারিবে এবং সর্ব্বোপরি আপন চরিত্র দৃঢ় করিতে পারিবে। এইরূপ বিধবা ও কুমারীদের দ্বারা সমাজের ও দেশের কি মহদুপকার সাধিত হইতে পারে এই পুস্তিকার শেষে তাহা বলিতেছি।

বাল্যবিবাহ

অল্প বয়সে পুত্রকন্যার জনকজননী হওয়া সমাজে অনেকের মতে আনন্দের কারণ বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। তাহা ছাড়া সমাজে যখন বিধবাবিবাহ নাই, তখন স্ত্রীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় অথবা স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের চিন্তায় যুবকেরা সাহসিকতা হারাইয়া ফেলে। যাহা হউক একটা নিশ্চিত কিছু আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে এবং যাহা-কিছু একটা পাইলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া যায়। এই কারণে বাল্যবিবাহপ্রথা জাতির বহু অকল্যাণ করিতেছে। সাহসিকতা বা অসাহসিকতা উন্নতির বিশেষ সাহায্য করে। বিধবাবিবাহপ্রচলন যেমন আবশ্যক হইয়াছে, বাল্যবিবাহ নিবারণও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

অবরোধপ্রথা

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা ও সিন্ধুপ্রদেশেই অবরোধপ্রথা আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে নাই। আসামের বাঙ্গালী অধিষ্ঠিত অংশে, অর্থাৎ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ধুব্ড়ী প্রভৃতি জেলায় আছে, আসামীদের মধ্যে নাই। কাশ্মীর, গাড়োয়াল, নেপাল, ভুটান, খাসিয়া ও অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশে নাই। ব্রহ্মদেশে অবরোধপ্রথার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। এখানে স্ত্রীলোকেরা যত স্বাধীন জাপানেও তত নহে। তুরস্ক ও ঈজিপ্ট পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়াছে। আফগানিস্তানেও শুনিতে পাইব কোন্ দিন পর্দ্দাপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই পর্দ্দার প্রথম সৃষ্টি ও বিস্তার। তাহা ছাড়া পৃথিবীর অপর কোন দেশে পর্দ্দা নাই। ভারতবর্ষে যে-সকল

স্থানে মুসলমানদিগের প্রভাব বেশী ছিল সেই সকল স্থানেই পর্দ্দা আসিয়াছে, অপর সকল স্থানে নয়।

অবরোধপ্রথাই আমাদের নারীদিগকে বেশী দুর্ব্বল ও অসহায় করিয়াছে। পর্দ্দা শহরে যত বেশী, পল্লীগ্রামে তত নয়। পল্লীগ্রামে পর্দ্দানশীন নারীরা পুকুরে স্নান করিতে যায়, মাঠে বেড়াইতে যায়। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাই কার্য্যোপলক্ষে শহরবাসী হইয়াছে। পর্দ্দা এই শ্রেণীর নারীদিগকেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করার জন্যই হয় ত পর্দ্দা-প্রথার উৎপত্তি। পঞ্জাবে আফগানিস্তানের দিক হইতে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার বেশি হইত। স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহির হইতে পারিত না। এই কারণে এখনও পঞ্জাবে বাড়ীর ছাদে মলমূত্র ত্যাগ করিবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। বৃষ্টি কম হওয়ার জন্য মাটির দেওয়ালের উপর মাটির ছাদ পাকা ছাদের মতই করা হয়। শহরেও পাকা বাড়ীর ছাদ মাটির তৈয়ারি। পাকা ছাদ রৌদ্রের তেজে ফাটিয়া যায়। ছাদে মলমূত্র ত্যাগ প্রথার ন্যায় পর্দ্দাপ্রথাও বর্জ্জনীয়। পর্দ্দার উৎপত্তি যে কারণেই হউক,, এখনও পর্দ্দার সমর্থন করা হয় পুরুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ঈর্ষার জন্য। ভয়, পাছে পর্দ্দার বাহির হইলে স্ত্রীর সতীত্বের হানি হয়। ইহা অপেক্ষা নারীর অপমান আর বেশি কি হইতে পারে? বাড়ীর ভিতর তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া বাহিরে ঢাক পিটাই আমাদের নারীর তুল্য সতীনারী জগতে দুর্লভ। তালাচাবির কথা যে বলিলাম ইহা অতিশয়োক্তি নহে। এই ব্রহ্মদেশেই আমি জানি দুইজন উচ্চ উপাধিধারী, উচ্চ বেতনভোগী বাঙ্গালী নিজেদের কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীর বাহির হইলেই, তাঁহাদের স্ত্রীদের তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেন।

এই অবরোধপ্রথার প্রভাব জাতীয় চরিত্রের উপর কতখানি তাহা বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়। অবরোধপ্রথার দরুণ আমাদের স্ত্রীজাতির সহিত মেলামেশা নাই। বিলাতে একেবারেই উল্টা, অবাধ মেলামেশা, এইখানেই চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রকৃত পরীক্ষা। এই স্থলে বিলাত প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে ব্রাহ্ম যুবকদের চারিত্রিক দৃঢ়তা বেশি দৃষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ ব্রাহ্মসমাজে নরনারীর মেলামেশা বেশি। অপরদিকে ব্রহ্মদেশে সম্পূর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশীয় যুবকেরা চারিত্রিক দৃঢ়তাহীন। ইহার কারণ, ইহারা স্বদেশেও যেমন বাহিরেও তেমন। নরনারীর সম্পর্কের ধারণা ইহাদের সমাজে আমাদের মত উচ্চ বা কঠিন নয়, অতএব আদর্শও অন্যরূপ। আমাদের সমাজে চরিত্রের যে আদর্শ, ঘরে বন্ধ রাখিয়া নারীর যে আদর্শ চরিত্র বজায় রাখিতে চেষ্টা করি, আমরা নিজেরা পরীক্ষাক্ষেত্রে সেই আদর্শ চরিত্র রক্ষা করিতে পারি না কেন? সকলেই পারেন না একথা বলিতেছি না। শিক্ষিত যুবক একজন না পারিলেও বিদেশে সমগ্র সমাজের নিন্দা হয়। এইরূপ ব্যবহার সমাজের ব্যাধিসূচক বলিয়াই বিবেচনা করি। ইহার একমাত্র কারণে আমাদের সমাজে নরনারীর মেলামেশা নাই। দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা চলিলে নরনারীর আলাপ পরিচয় মিলন সাধারণ হইয়া যাইবে; নরনারী উভয়েরই চারিত্রিক দৃঢ়তা বাড়িবে। যে কারণ আমাদের যুবকেরা চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষায় অপর অপেক্ষা হটিয়া যায় ভুবনেশ্বরে উকীলের পনর-ষোল বৎসর বয়স্কা বালিকা কন্যার বিপথগমনের এক কারণও তাহাই। এখন বালকবালিকা নয়-দশ বৎসর বয়স হইতেই পৃথক, যুবাবস্থায় ত কথাই নাই। এমন কি আমাদের ভগ্নী ও মাতৃস্থানীয়া বয়োধিকা অপর

গৃহস্থের স্ত্রীলোকদিগের সহিত পর্য্যন্ত আলাপ-পরিচয়ের সুবিধা নাই।

পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকেরা বাহির হইলেই লোকে, আমাদেরই লোকে, তাহাদের ব্রাকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকায় কেন? ইহার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নিকট পর্য্যন্ত আমাদের নারীরাই নালিশ করে এবং কত হৈ চৈ পড়িয়া যায়। আমাদের পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদের ইজ্জত কিরূপে রক্ষিত হয় তাহা শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার চিত্রাবলীতে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সাহেব ফিরিঙ্গীদের মেয়েরা এবং যে-সব প্রদেশে অবরোধপ্রথা নাই সেই প্রদেশের নারীরা ত এরূপে লাঞ্ছিতা হয় না। ইহার কারণ পর্দ্দানশীন নারীরা বাহির হয় না, লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না, বাহির হইলে এইরূপে লুক্কায়িত বস্তুটা কি দেখিবার ঔৎসুক্য হয়।

নারীদের স্বাস্থ্যের জন্যও অবরোধপ্রথা বর্জ্জনীয়। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ স্বাস্থ্যরক্ষার এক প্রধান উপায়। নানা কারণে অবরোধপ্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। অবশ্য বলা বাহুল্য আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একদিনে এককথায় ইহা উঠিয়া যাইবে না। ইহার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সমস্যা

রাজনৈতিক (political) সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার মত জ্ঞান আমার নাই বলিলেই হয়। তবে সাধারণভাবে দুই-একটি কথা বলিতেছি।

পুরুষ হোক স্ত্রী হোক সামাজিক জীবহিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন চারিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম তাহার নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব (individuality)। বুদ্ধি ও স্বাভাবিক কতকগুলি ক্ষমতা লইয়া সে জন্মিয়াছে। শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং অনুশীলন দ্বারা ক্ষমতা কার্য্যকরী হয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে যদি পুণ্য কাজ করে বা পাপ করে নিজেই তার ফলভোগ করিবে। ধর্ম্মও তার নিজস্ব জিনিষ। বাহ্যাড়ম্বর ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম আন্তরিক। আমরা না বুঝিয়া কোন জিনিষ খাওয়া-না-খাওয়া, স্নান করিয়া বা স্নান না করিয়া খাওয়া, ছোঁয়া, বসা প্রভৃতি অবান্তর জিনিষকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি এবং অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল তুচ্ছ ব্যবহার লইয়া ধর্ম্মের নামে যাহা অধর্ম্মের চূড়ান্ত,—লুণ্ঠন, নরহত্যা পর্য্যন্ত—করি। কেঁদুলীতে (বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রাম) এক সন্ন্যাসী অর্দ্ধদগ্ধ মড়ার মাংস টানিয়া লইয়া ভক্ষণ করিতেন। অথচ প্রত্যেক হিন্দু তীর্থযাত্রী তাঁহার পদে মাথা লুটাইত। পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও দেশনায়ক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হিন্দু হইলেও তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক স্থলেই স্বামী প্রোটেষ্টাণ্ট এবং স্ত্রী রোমান ক্যাথলিক এমন কি বৌদ্ধ, হিন্দু বা মুসলমানও

হইতে পারে। জাপানের একই পরিবারে পিতা বৌদ্ধ, মাতা খৃষ্টান, পুত্র হয়ত শিন্তো এবং কন্যা খৃষ্টান। ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ যখন আমরা বুঝিতে পারিব তখনই ধর্ম্মের নামে আজকাল যে অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার অবসান হইবে। ধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব জিনিষ, ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক কলহ বিবাদ করাই অধর্ম্ম।

দ্বিতীয়—পারিবারিক সম্বন্ধ। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং দাস দাসী লইয়া যে পরিবার, এই পরিবারের লোকদিগের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য আছে এবং তাহার প্রতিও পরিবারের লোকদিগের কর্ত্তব্য আছে। পরিবার তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া ও শিক্ষা দান করিয়া মানুষ করে এবং তাহাকেও পরিবারের লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলে পরিবারও নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়—বহু পরিবার লইয়া যে সমাজ সেই সমাজের সহিত সম্বন্ধ। সমাজের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য আছে এবং সমাজেরও তাহার প্রতি কর্ত্তব্য আছে। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলে সমাজও সকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয়।

চতুর্থ—দেশ বা রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ। পরিবার ও সমাজের মত ব্যক্তি সকল লইয়াই দেশ। যে-দেশের লোক দেশের প্রতি কর্ত্তব্য বুঝিয়াছে এবং পালন করিয়াছে সেই দেশও ব্যক্তিসকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাপানে এমন দরিদ্র কেহই নাই যে পেট ভরিয়া দুই বেলা খায় না, যথেষ্ট বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করে না এবং পায়ে জুতা পরে না। ইংলণ্ড সমস্ত বৃদ্ধবৃদ্ধাকে পেন্সন দেয় এবং শ্রমিকদের কাজ না থাকিলে তাহাদিগকে

খাদ্য দেয়। দেশের সকলেই যাহাতে সুখে থাকে, কেহ কাহারও উপর অত্যাচার না করে, অত্যাচারীর দমন হয়, দেশের সকল লোকেরই শিক্ষার দ্বারা যাহাতে ব্যক্তিত্ব বা নিজত্বের বিকাশ হয় এই সকলের জন্য দেশের সকলের সমবেত চেষ্টার আবশ্যক এবং এই উদ্দেশ্যেই আইনকানুন প্রয়োজন হয় এবং এই সকল আইনকানুন প্রবর্ত্তনের জন্য বিচারক, শিক্ষক, শাসক, পুলিশ প্রভৃতির দরকার হয়। এই সকল লইয়া রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি। আমাদের দেশের লোকের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে দেশের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই। এই কারণে বাহিরের লোক আসিয়া আমাদের দেশ লুণ্ঠন করিয়াছে এবং আমাদিগকে নিজের দেশেই পরের অধীন হইতে হইয়াছে। যাঁহারা দেশ জয় করিয়াছে তাহাদের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত অবশ্যই তাহারা করিবে। ইহাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতি এখন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রনীতি চালাইবার জন্য দেশের অন্নে অপর দেশীয়েরা প্রতিপালিত হইতেছে অথচ দেশের লোকেরই অন্নাভাব। রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানের শিক্ষার অভাবে যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নয়, যাহা মাত্র লোকাচার তাহাকেই দেশেরও উপরে স্থান দিয়া আসিতেছি। ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, ইতালীয়, আমেরিকান প্রভৃতি খৃষ্টান হইলেও যীশুর জন্মস্থান প্যালেস্তাইনের অধীন হইতে কেহই চায় না। সকলেই দেশের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান গৌরবে গরীয়ান। কিন্তু এ দেশের মুসলমানেরা খলিফার অধীন হইতে চান, কিন্তু প্রকৃতদর্শী কামাল পাশা খলিফার দেশেই খলিফার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছেন এবং ধর্ম্মকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। দেশের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকাতেই ইংরেজ যোদ্ধা, নাবিক, ব্যবসাদারেরা নানা দেশ জয় করিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে যোজনা

করিয়াছে। এমনি করিয়াই ইংলণ্ড বড় হইয়াছে। মুসলমান দেশ জয় করিয়া নিজেই বড় হইতে চাহিয়াছিল, তাই কৃতকার্য্য হয় নাই। ভারতীয় মুসলমানগণ যাঁহারা ভারতকে স্বভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং কয়েকশত বৎসরে যাঁহাদের জীবন ও দেহের অণুপরমাণু ভারতীয় হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সকলেই ভারতীয় এবং সম্ভবত হিন্দু, তাঁহারা সকলেই ভারতের পূর্ব্বগৌরবে হিন্দুদের মতই অধিকারী। কিন্তু এখনও তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার ত্যাগ করিয়া আরবের গৌরবে জোর করিয়া গৌরব বোধ করেন। প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগরিত হইলে এরূপ থাকিবে না।

যে-দেশের লোক শিক্ষার দ্বারা পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছে এবং এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা ও যত্ন করে সেই দেশই উন্নত। আর যে-দেশের সমাজের মধ্যে কলহ বিদ্যমান এবং দেশাত্মবোধ নাই সেই দেশই পরপদলেহী অথবা অনগ্রসর। পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং এই কর্ত্তব্যপালনই মানুষকে পশু হইতে পৃথক্ করে। যে-ব্যক্তি স্বার্থপর, কেবল নিজের সুখসুবিধাই দেখে তাহার ও বনের পশুর মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? যে ব্যক্তি পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করে সে তদপেক্ষা উন্নত, যে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজকে দেখে সে আরও উন্নত এবং যে-পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করে সে-ই প্রকৃত মানুষ। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কর্ত্তব্য প্রত্যেককে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জাপানী বালকবালিকাকে এই সকল কর্ত্তব্যের কথা বুঝাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পাঠ্যাবস্থায় প্রতি দিন এই সকল কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ড, ফরাসী, ইতালী, জর্ম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

নিজের উন্নতিসাধন এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন দেশেরই কার্য্য। যে-দেশ ও সমাজ এক এবং যে দেশে সমাজ বিভক্ত নয়, (যেমন জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ) সেই দেশই অগ্রসর। আমাদের দেশে এমন শিক্ষার প্রচার আবশ্যক হইয়াছে যাহাতে সকলেই বুঝিবে যে ধর্ম্ম আলাদা হউক, বিবাহ পান ভোজনাদি আলাদা হউক, আমরা যখন একদেশবাসী তখন এক সমাজভুক্ত। এখনকার নানা জাতি সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ। ভবিষ্যতে হয়ত জাতিভেদের সমস্যা বা ধর্ম্মভেদের সমস্যা থাকিবে না। কিন্তু সেই সত্য যুগ কখন আসিবে তাহা আমাদের চেষ্টা ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরাধীন হওয়ায় আমাদের রাজনীতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রায় সকল স্বাভাবিক প্রচেষ্টাই এখন রাষ্ট্রনীতির আন্দোলনে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনই রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য পালন নয়। অনেকেরই বিশ্বাস রাষ্ট্রনীতির সমাধান হইলেই, অর্থাৎ স্বরাজ পাইলেই, অপর সমস্ত সমস্যার সমাধান সহজেই হইবে। কিন্তু স্বরাজলাভ ও তারপর তাহা পরিচালনাই যে বিষম সমস্যা। প্রশ্নটি যে কত জটিল তাহা হিন্দু-মুসলমানের কলহ বিবাদ দাঙ্গা হইতেই অনুমেয়। স্বরাজ লাভ করিব এই আশাতে প্যাক্ট ইত্যাদি কত কি দ্বারা কিরূপে চাকুরি ইত্যাদির ভাগবাঁটোয়ারা করিব তাহার তর্ক মাত্র লইয়াই নিজেদের মধ্যে গলা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক সমস্যা। এই কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্বরাজলাভের পর অপর সকল সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করিব এইরূপ মনে করিয়া থাকা অবিবেচনার কার্য্য। চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, অপর সমস্যাগুলি রাজনৈতিক সমস্যাসমাধানের সহায়ক,

অতএব ঐ সকল সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন।

দেশবাসীদিগের মুসলমান ও অমুসলমান বলিয়া বিভাগ, দলাদলি ও বিরোধই দেশবাসী সকলেরই বহু অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালায়, শুধু বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে কত জাতি আছে। এমন জাতি আছে যাহাদের সামাজিক রীতি, আহারাদি মুসলমানদের বা হিন্দুদের মত নয়; তাহা ছাড়া এমন খাদ্যও তাহারা খায় যাহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অস্পৃশ্য মনে করে। ইহারাও হিন্দু বা প্রকৃত-পক্ষে হিন্দুস্থানের সমাজভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। বাল্যকালে গ্রামে অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলমানদিগকেও সমাজের এক জাতি বলিয়াই জানিতাম। এখনও হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের সঙ্গে খুড়া জ্যেঠা সম্পর্ক পাতান আছে। ভারতবর্ষের বাহিরে বা অন্যত্র যাহাই হউক, বাঙ্গালীর পল্লীতে মুসলমান সমাজের এক জাতি বলিয়াই বিবেচিত হইত। মুসলমানদের ন্যায় বা তদপেক্ষা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিসকলের এই মুসলমান-অমুসলমান নীতি দ্বারা বহু ক্ষতি হইয়াছে। মুসলমানদিগকে সমাজের একজাতি বলিয়া বিবেচনা করিলে অনেক অযথা বিরোধের সৃষ্টি হইত না। ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অমঙ্গল। গভর্ণমেণ্টও যদি ভেদনীতি অনুসরণ করিয়া এইরূপ বিভাগ প্রবর্ত্তন করেন, দেশের কল্যাণের জন্য দেশবাসীর ইচ্ছা হইলে ইহা শোধরাইতে দেরী হইবে না।

মুসলমান যেমন সমাজের এক অঙ্গ, অন্যান্য জাতিও সেইরূপ সমাজের অঙ্গ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যও সেইরূপ সমাজের অঙ্গ হইলেও কেবল তাহাদের উন্নতিতে সমগ্র সমাজের উন্নতি হয় নাই, হইতে পারে না। কতকগুলি মুসলমান শিক্ষায় উন্নত হইয়া চাকুরি পাইলেও

সমাজের অবশিষ্টাংশের অবস্থা এখন যেমন সেইরূপই থাকিবে। জাতি বা সমাজের অঙ্গনির্ব্বিশেষে সকলেরই যতদিন না উন্নতি হইতেছে ততদিন সমস্ত দেশ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য। দুইটা, পাঁচটা উকীল, ডেপুটী, জজে কিছুই হইবে না।

শিল্পে উন্নত কলকারখানাপ্রধান বিলাত ও আমেরিকার দেখাদেখি আর এক অনিষ্টকর বিভাগের প্রচলন এদেশেও সুরু হইয়াছে। ইহা শ্রমিক ও ধনিক। জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) ইহা এক প্রধান আলোচনার বিষয়। ইহার জন্য বড় বড় আপিস হইয়াছে ; বহু পণ্ডিত গবেষণা ও অনুসন্ধান করিতেছেন। আমাদের দেশেও ইহার এক শাখা বসিয়াছে। কিন্তু এই সকল শ্রমিক অপেক্ষাও দরিদ্র এবং সংখ্যায় বহুগুণে অধিক কৃষিজীবীর জন্য কি হইতেছে? শ্রমিকেরা পরের কাজ করে। একত্রীভূত হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়া ধনিক এবং নিজেদেরও সমূহ আর্থিক ক্ষতি করিতে পারে। তাই তাহাদের এত আদর আব্দার। শ্রমিকেরা দরিদ্র, তাহাদের অবস্থার উন্নতি সুখের বিষয়। তুলনায় কৃষিজীবীদের জন্য চেষ্টা কম হইতেছে ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য। ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

আমাদের দেশে প্রত্যেক চারিজনের মধ্যে তিনজন কৃষিজীবী, অতএব প্রকৃত বিভাগ হওয়া উচিত কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী, কিন্তু কৃষিজীবীরাই এখন প্রকৃতপক্ষে অন্তরালে পড়িয়াছে। আইনসভা প্রভৃতিতে অকৃষিজীবী উকীল, মোক্তার, জমিদার ও চাকুরিয়াদিগেরই প্রাধান্য। আমাদের বিলাতী প্রভুরা শ্রমিকদিগের জন্য চিন্তা করেন এবং তাহাদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। এখন হইতে সাবধান না হইলে ভবিষ্যতে নূতন এক বিবাদের উৎপত্তি নিশ্চয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য আমাদের প্রধান

প্রয়োজন হইতেছে সহযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন। এই সহযোগ শিক্ষাসাপেক্ষ, মুখের কথায় হয় না। অল্প বয়স হইতে সহযোগ এবং সহযোগে কর্ম্ম করিতে শিক্ষা করিতে হয়, যে কর্ম্মই হউক, এমন কি খেলা, খেলাতেও হারজিত আছে। হারজিত মানিয়া লওয়ার শিক্ষা একটি মস্ত শিক্ষা। আমাদের এই শিক্ষা নাই বলিয়াই রাজনীতিক্ষেত্রে এখন কি কেলেঙ্কারিই না হইতেছে। একই কর্ম্ম করিয়া জীবনপাত করিতে উদ্যত, কিন্তু তোমার সহিত আমার মত মিলিল না, হয়ত সামান্য কারণেই, অমনি আলাদা দল গড়িয়া লইলাম। সরকারের সহিত যুদ্ধ করিতে নামিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হইতে লাগিল নিজেদের মধ্যে। শক্ররূপে সরকার যদি যোদ্ধাদের কাহাকেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাহায্য করেন তখন কিন্তু সরকারের উপর চোখ রাঙাই এবং সরকারকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করি। সহযোগে সহানুভূতি আসে। সহানুভূতি ভ্রাতৃভাব জন্মায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষা কি? আমরা হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি হাজার জাতিতে বিভক্ত হইয়া প্রথম হইতেই অসহযোগ সুরু করিয়া দিয়াছি। জ্ঞান হইবা মাত্র বালক-বালিকার প্রথম শিক্ষা—আমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ, আমি হাড়ি, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান। কেহ কাহারও ছোঁয়া অন্নজল খাইবে না, এমন কি ছুঁইলে স্নান করিয়া তবে শুদ্ধ। অসহযোগ আমাদের মজ্জাগত। পরস্পরের সহিত সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাব আসিবে কোথা হইতে। ভ্রাতৃভাব ও সহানুভূতি ব্যতীত মিলিয়া এক হইব কিরূপে? এই যে বিভিন্নতার ভাব ইহা একদিনে জন্মে নাই এবং একদিনেই দূর হইবারও নয়। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের ভাব কেবল শিক্ষা এবং মেলামেশার দ্বারাই দূর হওয়া সম্ভব। শিক্ষা এমন হওয়া

উচিত যাহাতে দেশাত্মবোধ জাগরিত হয়। এইরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনের কথা অনেকেই জানেন, বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। ইহার ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে পরে বলিতেছি।

শিক্ষা-সমস্যা

এই পর্য্যন্ত যে সকল সমস্যার আলোচনা করিয়াছি সে সকলেরই সমাধানের উপায় উপযুক্ত শিক্ষা। অতএব উপযুক্ত শিক্ষানির্দ্ধারণ এবং তাহার প্রচলনই সকল সমস্যার প্রধান।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধির দ্বারা অপর জীবজন্তু হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। এই বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ভালমন্দ, ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান এবং অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করা যায়। ঈশ্বরই যদি খাদ্য ইত্যাদি মানুষের সমস্ত প্রয়োজনীয় জোগাড় করিয়া দিবেন তাহা হইলে মানুষের হাত, পা, মন, বুদ্ধি দিতেন না। আমরা যদি এই বুদ্ধির সদ্ব্যবহার না করিয়া বসিয়া থাকি, বুদ্ধি কাজে লাগাইবার চেষ্টা না করি তাহা হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করি। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এই বুদ্ধিবৃত্তির এবং সকল নরনারীর ভিতর যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে তাহার বিকাশ দ্বারা যাহা-কিছু প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করা। অতএব যে শিক্ষা স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং কার্য্যকারিণী শক্তির চালনা শিক্ষা না দেয় তাহা শিক্ষাই নহে।

স্বাধীন চিন্তা অর্থে যথেচ্ছাচার নহে। আমি যাহা বুঝি তাহা হয়ত ভুল। অপরেরও এই সম্বন্ধে বলিবার কি আছে তাহা শুনিয়া বিচার করিয়া যাহা ঠিক তাহা গ্রহণের নামই স্বাধীন চিন্তা। শিক্ষা এই বিচার-বুদ্ধি জন্মাইবে এবং স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিবে। দুই হাজার তিন হাজার বৎসর বা আরও বেশী পূর্ব্বে যাহা

শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহাই এখনও জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য বিধান হইতে পারে না। মূলনীতি যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য। কিন্তু কতকগুলি নীতি সাময়িক। দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রের লিখিত নীতিও এখন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা যাহারা ইহা না করিবে তাহারাই পশ্চাতে পড়িতে বাধ্য। ইউরোপীয়েরাও এক সময় প্রাচীন শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই গণ্ডী ছাড়াইয়া যখন তাহারা স্বাধীন চিন্তার দ্বারা পন্থা ঠিক করিয়া লইল এবং তদনুসারে চলিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই তাহাদের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল।

একবার ব্রহ্মদেশের এক শহর হইতে আমেরিকাবাসী এক মিশনারী-দম্পতির সহিত জাহাজে যাইতেছিলাম। তাঁহারা কোন একটি স্কুলের পরিচালক। মিশনারী-পত্নী, আমি হিন্দু এবং বাঙ্গালী জানিয়া কথাচ্ছলে বলিলেন, "দেখুন আমাদের স্কুলে একজন বাঙ্গালী শিক্ষক আছেন, তিনি বি-এ পাশ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় আপনাদের দেশের শিক্ষারই দোষ, তিনি practical নন মোটেই (অর্থাৎ কার্য্য উদ্ধার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই)। আমাদের দেশে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে-কাজই হোক না কেন আমরা উদ্ধার করিতে সক্ষম হই।" আমাদের শিক্ষার দোষেই যে আমরা সকল কার্য্য হইতে হটিয়া যাইতেছি তাহা অনেক স্থলেই বলিয়াছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন এই কুশিক্ষার প্রতিকার এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন নিতান্ত আবশ্যক। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই; চেষ্টা দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই অবস্থা ফিরাইতে পারা যাইবে। চেষ্টার আবশ্যক, বসিয়া ভাবিবার সময় নাই।

শিক্ষার প্রথম সোপান

দুই পাতা পড়িতে পারিলেই শিক্ষা হয় না। পড়িতে পারিবার ক্ষমতার প্রধান উদ্দেশ্যই এই হইতেছে যে, নানা বিষয়ের জ্ঞান পুস্তক হইতে অর্জ্জন করিতে পারা যাইবে। কতকাল ধরিয়া পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ কত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উপকারের জন্ম। পুস্তক পড়িয়া এই সকল পুঞ্জীকৃত তত্ত্ব সহজেই আয়ত্ত করিতে এবং এই সকলকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারা যায়; মুদ্রাযন্ত্র এবং লিখনপঠন-ক্ষমতাই পৃথিবীর এত দ্রুত উন্নতি সাধন করিতেছে। লিখনপঠন-ক্ষমতাই শিক্ষা নয়, ইহা শিক্ষার সোপানস্বরূপ এবং প্রধান সোপান। এই জন্যই ইংরেজ, জর্ম্মাণ, আমেরিকান জাপানী প্রভৃতি জাতি—যাহারা সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করিয়াছে তাহারাই—আজ পৃথিবীর জাতিসকলের মধ্যে উন্নত। দেশের সকলে লিখিতে পড়িতে পারিলে সকল বিষয়ের নূতন নূতন প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকলের মধ্যে প্রচার করিতে পারা যায়; ইহাই উন্নতির প্রধান বা একমাত্র উপায়। লিখন-পঠনে অক্ষমতা জাতীয় উন্নতির অন্তরায়। আমাদের ভিতর একশত জনের মধ্যে নব্বই জনই নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা দূর করিতে না পারিলে উন্নতির কোন আশা নাই। উন্নতির পরিবর্ত্তে এখন আমরা অবনতির মুখে সবেগে চলিয়াছি।

শিক্ষার বিষয়ে প্রথম সমস্যা হইতেছে সার্ব্বজনিক লিখনপঠন-প্রথার প্রচলন। প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষণীয় করিবার জন্ম এতদিন কল্পনা-জল্পনাই চলিয়া আসিতেছে। ইংরেজ-রাজ

বলিতেছেন পয়সা কোথায়? নূতন কর ধার্য্য করিয়া পয়সা জোগাড় করিবার প্রস্তাব হইতেছে। তা-না-না-না করিতে করিতেই যে কতকাল কাটিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার উপর সরকারী বন্দোবস্তে যে কত পয়সার অপচয় হয় তাহার ঠিকানা রাখে বা প্রতিকারের চিন্তা করে কয়জন? আর্ল সাহেব যখন বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার তখন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত হয়। এই শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রথমেই ইন্‌স্পেক্টর, য়্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর, য়্যাসিষ্টাণ্ট ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর, ইন্‌স্পেক্টীং পণ্ডিত এবং তাঁহার নীচেও য়্যাসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইলেন। গ্রাম্য শিক্ষকের আয় কিন্তু সেই পূর্ব্ববৎ পাঁচ, সাত, আট দশ টাকা। কোথাও কোথাও পেটের ভাত ও মাত্র দুই তিন টাকা। পরিদর্শনের জ্বালায় এই সকল শিক্ষকের প্রাণান্ত। মাসের মধ্যে হয় ত পাঁচ সাত দিন পরিদর্শনই হইতেছে।

কর বসাইয়া যে প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন হইতেছে তাহা হইতে সকল বালকবালিকাই যে শিক্ষা পাইবে তাহা আশা করা যায় না। তা ছাড়া যেরূপ শিক্ষার এখন প্রয়োজন আমাদের প্রাথমিক শিক্ষকশ্রেণী হইতে সেরূপ শিক্ষা দান আশা করা যায় না। শিক্ষকদেরই শিক্ষার প্রয়োজন। আরও বিশেষ প্রয়োজন বালক-বালিকাদের মাতাপিতাদেরও শিক্ষার। ইহার বন্দোবস্ত হইবে কিরূপে এবং কতদিনে? দেশবাসীরা সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরা উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে কখনও হইবে কি-না কে জানে।

শিক্ষার বিভাগ

মোটামুটি শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে শিক্ষার নিম্নলিখিতরূপ ভাগ করা যায়।

শিশুদিগের প্রায় তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাথমিক বা প্রথম স্তরের শিক্ষা। আমাদের পাঠশালা বা প্রাইমারী স্কুলে যে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয় জাপান প্রভৃতি দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সহিত তাহার তুলনাই হয় না।

তারপর প্রায় আঠার-উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকাদের মধ্যশিক্ষা যাহাকে এখন secondary education বা দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা বলা হয়। অপর অনেক দেশে ইহা ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়াই শেষ হয়। আমাদের দেশে এখন প্রকৃতপক্ষে ইহা আই-এ, ও আই-এস্‌সি পাশ করিয়া শেষ হয়।

তারপর উচ্চশিক্ষা, সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম্-এ, পাশ করাতে যাহা বুঝি এবং শেষ শিক্ষা যেমন ডাক্তারী ওকালতী প্রভৃতি।

সাধারণ জ্ঞানের জন্য শিক্ষা দ্বিতীয় স্তরেই শেষ হওয়া উচিত এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়া ইহার পর ক্ষমতা, রুচি ও বুদ্ধি অনুসারে জীবিকার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ—যেমন ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং, আইন, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি অবলম্বন করা উচিত। সকল উন্নত দেশেই সেইরূপ বন্দোবস্ত আছে। কোন কোন দেশে, যেমন জাপানে, দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার আবার দুইটি ভাগ করা হয়। যাহারা শিল্পবিদ্যালয় ও ব্যবসায়ে যোগ দেয় বা কলকারখানায় শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিতে যায়

তাহারা দ্বিতীয় স্তরের মধ্যভাগ (আমাদের ম্যাট্রিকুলেশনের সমান) শেষ করিয়াই তাহা করিতে পারে। যাহারা উচ্চশিক্ষার পথে যাইতে চায় তাহারা দ্বিতীয় স্তরের উপর ভাগ (আমাদের আই-এ ও আই-এস্‌সি-র সমান) শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

উপরে যে তিন স্তরের শিক্ষার কথা বলিলাম তাহার প্রথম দুই স্তরকে, অর্থাৎ শিশু ও বালকবালিকাদের শিক্ষাকে 'সাধারণ শিক্ষা" বলিব। সাধারণ শিক্ষাই পরবর্ত্তী বিশেষ ও উচ্চশিক্ষার ভিত্তি। সাধারণ শিক্ষা যত উৎকৃষ্ট হইবে ততই মঙ্গল। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা এত নিম্নস্তরের করিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এত অল্প হইতেছে যে, বহু চাকুরি হইতে বাঙ্গালীর ছেলে হটিয়া যাইতেছে এবং বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর ছেলের বিঘ্ন হইতেছে। পাশের সার্টিফিকেটের মোহ এত বেশী যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভুল শোধরাইতে বহু বেগ পাইতে হইবে। আমাদের দেশেই পূর্ব্বে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াই ওকালতী, ডাক্তারী এবং নানাবিধ চাকুরির পথ অবলম্বন করা সম্ভব হইত, তাহার জন্য এখন বি-এ পাশ করিতে হয়। সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়াই যাহা সম্ভব তাহার জন্য বেশী সময় নষ্ট করাতে সময়ের অপব্যবহার ত হয়ই, ইহা ছাড়া জীবনগঠনের উপযোগী কালের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার না হওয়াতে ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষতি হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পাশ করিবার পরই সকল দ্বার উন্মুক্ত হওয়া উচিত এবং প্রবেশ-প্রার্থীদের পাশের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর না করিয়া বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা নির্ব্বাচন হওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা জাপান, ইংলণ্ড, জর্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি

অগ্রসর দেশে বাধ্যতামূলক এবং বিনাবেতনে সাধিত হয়। আমাদের দেশে নব্বই জন নিরক্ষর, কিন্তু এই সকল দেশে নব্বই জনেরও অধিক লিখনপঠনক্ষম। তাহা ছাড়া আমাদের দেশে পাশ করিয়া বাহির হইলেই অধিকাংশের পক্ষে শিক্ষা শেষ হয়। কিন্তু ঐ সকল দেশে শিক্ষার কাল সীমাবদ্ধ নহে। সারা জীবন ধরিয়া যাহাতে শিক্ষা চলে তাহার সমূহ চেষ্টা চলিতেছে। কারণ পূর্ণবয়স্ক নরনারী শিক্ষিত হইলেও পৃথিবীর ক্রমেই উন্নত হইতে উন্নততর গতির সমসাময়িক জ্ঞানের প্রয়োজন ও উপকারিতা তাহারা বুঝিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে যে-সকল দেশ উন্নততম—যেমন জাপান, ইংলণ্ড, জর্ম্মানী, আমেরিকা—তাহাদের মধ্যে 'ফ্রি ইউনিভারসিটি' প্রভৃতি নাম দিয়া নূতন নূতন পাঠাগার স্থাপন করিয়া, এই সকলকে কেন্দ্র করিয়া, নানারূপ বক্তৃতার আয়োজন করিয়া, সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাঠের উৎসাহ দিয়া, নানারূপ সভা-সমিতি করিয়া, মিউজিয়াম ইত্যাদিতেও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত করিয়া জাতির সমস্ত পূর্ণবয়স্ক নরনারীই যাহাতে আধুনিক জ্ঞানে অগ্রসর হইতে পারে তাহার কেবল চেষ্টা নয়, যথোপযুক্ত ব্যাবস্থাও করা হইতেছে। শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণবয়স্ক নরনারী পর্য্যন্ত সকলেরই এইরূপ শিক্ষা দ্বারাই ঐ সকল জাতি উন্নত।

এখন স্কুলকলেজে পড়ে এমন বাঙ্গালীর ছেলেরও সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান, যাহাকে "general knowledge" বলা হয়, বড় কম। নিজের পড়ার বই ছাড়া নানা বিষয়ের সাময়িক পত্র (journals এবং magazines) এবং পুস্তক পড়া নিতান্ত দরকার। ইহা দ্বারা জ্ঞান ও মন প্রশস্ত হয় এবং চলিত কথায় যাহাকে চালাক, কর্ম্মক্ষম, (efficient) বলে, এইরূপ চালাক হইতে বহু সাহায্য করে। ইহার জন্য পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাঠ (study

circles) দরকার। সকলেই সকল রকম বই পত্রিকা ইত্যাদি কিনিতে পারে না। এই সকল পাঠাগারে কেবল মাত্র ইংলণ্ডের পত্রিকাদি না রাখিয়া জাপান, অষ্ট্রেলিয়া কানাডা, আমেরিকা, জর্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি অপর উন্নতিশীল দেশের পত্রিকাদিও রাখা উচিত।

শিক্ষার মোটামুটি ভাগ হওয়া উচিত এইরূপ—

প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা, যাহা দেশের প্রত্যেক বালকবালিকার হওয়া উচিত। জাপান কিরূপ উন্নত প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে অন্যত্র বিস্তারিতরূপে বলিয়াছি। *

দ্বিতীয়, মধ্যশিক্ষা। ইহা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াই শেষ হওয়া উচিত এবং সাধারণ জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। জাপান কিরূপ মধ্যশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে অন্যত্র* তাহারও আভাস দিয়াছি।

তৃতীয়, উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষা, ডাক্তারী, ওকালতী ইত্যাদি, মধ্যশিক্ষার পরেই এই সকলের পথ খোলা থাকা উচিত।

চতুর্থ, পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর শিক্ষা। জাপান, এবং বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে, ইহার কিরূপ বন্দোবস্ত আছে তাহার আভাস পরে দিতেছি।

শিক্ষার পদ্ধতি

আমাদের গ্রাম্য পাঠশালার জ্ঞান যাঁহাদের আছে তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ছোট ছেলেমেয়ে সমস্ত দিন ধরিয়া এক কোণে দাগা বুলাইতেছে, শিক্ষক মাত্র দু-পাঁচ মিনিটও দেখেন কি না সন্দেহ। ইহাদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্বন্ধ শিক্ষাদাতারূপে কম হইলেও দণ্ডদাতা-রূপে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। শিক্ষার সহিত প্রথম পরিচয়েই

* মৎপ্রণীত 'জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে' নামক পুস্তিকা দেখুন।

এইভাবে পাঠ এবং জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয় এবং প্রাণে একটা ভীতি জন্মাইয়া দেয়। যদি আধুনিক কিণ্ডার গার্টেন ইত্যাদি প্রথায় খেলাধূলা ও আমোদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় তাহা হইলে অল্প বয়স হইতেই শিক্ষার উপর আগ্রহ জন্মে এবং মনের স্ফূর্ত্তিরও বিকাশ হয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রথম ভাগ শেষ করিতেই বৎসরাধিক কাল কাটিয়া যায়। কিন্তু দেখিয়াছি আমার পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যা তিন মাসের মধ্যেই যে-কোন বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে পারিত। শিক্ষার পদ্ধতি অনুসারে বালকবালিকা, যুবা প্রৌঢ় সকলেই অতি অল্প সময়েই লিখনপঠনক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে।

স্কুলেও যাহাতে বালকবালিকাদের প্রকৃত জ্ঞান হয় এরূপ ভাবে পাঠ বুঝাইয়া পড়ান খুব কম হয়। বহিতে পাঠের পরিমাণ না পড়াইয়াই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। পাঠার্থী যেমন করিয়া হউক আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। না পারুক পাঠ বলিতে থাকে। ইহার দরুণ জ্ঞান তঅল্পই হয়, তা ছাড়া বহু সময়ও বৃথা ব্যয়িত হয়। সময়ের এইরূপ অপচয়ের কুফল সম্বন্ধে শিক্ষার বিভাগের বর্ণন প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা ইয়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আজকাল এই ইয়ুনিভার্সিটি নিকৃষ্ট ইয়ুনিভার্সিটির উপমাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বি-এ পাশ করিয়াও একটি দরখাস্ত লিখিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম। অপরাপর ইয়ুনিভার্সিটির অনেক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ছাত্রেরও ইহাদের অপেক্ষা ইংরেজী জ্ঞান বেশী। শুধু ইংরেজী জ্ঞান কেন, পরলোকগত শশধর রায় মহাশয় আমাদের বি-এর মাতৃভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের যাহা পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে, সকল বিষয়েই আমাদের ছাত্রেরা অতি ভাসা-ভাসা জ্ঞান মাত্র অর্জ্জন করে। দেশের

এখন অনেক বড় বড় চাকুরির পথ উন্মুক্ত হইতেছে। এই সকলের জন্য প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী ছাত্রেরা যে পশ্চাৎপদ হইতেছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-মন্ত্রী সার ক্লড্ হিল পুনায় বলিয়াছিলেন, 'কলিকাতা ইয়ুনিভার্সিটির ছেলেরা ইংরেজীতে কথা কহিতে ও ইংরেজী লিখিতে অপর ইয়ুনিভার্সিটির ছেলে অপেক্ষা নিকৃষ্ট।' আমরা লজ্জায় অধোমুখ হইলাম। বিশেষ মান্দ্রাজের ছেলেরা যে অনর্গল ইংরেজীতে কথা কহিতে পারে, বাঙ্গালীর ছেলে অপেক্ষা অনেক ভাল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, কেশব সেন প্রভৃতির স্বজাতীয়ের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই লজ্জার কথা। ইয়ুনিভার্সিটির কর্ণধারেরা ইহার প্রতিকারের উপায়স্বরূপ ইংরেজীতে এক 'ডিগ্রীর' প্রস্তাব করিলেন। হায় রে কপাল! ডিগ্রীর মোহই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই অতিসাধারণ সত্যটা কাহারও মনে উদয় হইল না যে, কথা কহিলেই কথা কহা শিখা যায়। বাঙ্গালীর ছেলে ঘরে, স্কুলে, কলেজে কোথাও ইংরেজীতে কথা কয় না, কাজেই ভাল কহিতে পারে না। নিয়ম কর যে অন্ততঃ যে কয়ঘণ্টা স্কুলকলেজে থাকিবে ততক্ষণ ইংরেজীতে কথা কহিতে হইবে। অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। স্কুলকলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাঁহারা না করেন, মৌখিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত কর। যে কথা কহিতে না পারিবে, ফেল হইবে। এই সহজ উপায় না করিয়া কথা কহার 'ডিগ্রীর' প্রয়োজন! ইহার পর বোধ হয় বাঙ্গালীর উঠা, বসা, চলা, খাওয়ারও ডিগ্রীর প্রয়োজন হইবে। হাঁচি-টিকটিকির বিধানে ত আমাদের সমাজ আড়ষ্ট হইয়াই রহিয়াছে; তাহার উপর আবার এমন ডিগ্রীর দৌরাত্ম্য!

প্রথম পরিচয়ে কথাবার্ত্তায় এবং চালচলনেই লোকের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয় এবং এই প্রথম ধারণাই বহু কার্য্য করে। অধিকাংশ বাঙ্গালীর ছেলের উপর প্রথম তাহাদের 'গুড্ মর্র্নিং'এ এবং সাধারণ আড়ষ্ট ভাবে ধারণা বেশ ভাল হয় না। তাহার উপর বি-এ, বি-এস্‌সি, পাশ করিয়াও অধিকাংশেরই নির্ভুল ইংরেজী লিখিবার অক্ষমতার দরুণ চাকুরিজীবী বাঙ্গালী বহু চাকুরি হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে।

নির্ভুল ইংরেজী লেখা এবং ইংরেজীতে কথা বলার প্রয়োজন ততদিন যতদিন বাঙ্গালী চাকুরির উপর নির্ভর করিবে। জাপানের বড় বড় বৈজ্ঞানিক রথীদের ইংরেজীতে লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তকের ভাষা বিশুদ্ধ প্রায়ই হয় না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঐ সকল গবেষণা আগ্রহের সহিত পাঠ করে। কারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যই গ্রহণীয়, প্রকাশ করিবার ভাষা নহে। অধিকাংশ মাড়োয়ারী ইংরেজী জানে না। ইংরেজ প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা তাহাদেরই ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের সহিত ভাবের আদানপ্রদান করে। তাই বলিয়া বাঙ্গালীর ছেলের পাশ করিয়াও ইংরেজীতে কথা কহিবার বা কাজ চালাইবার মত নির্ভুল ইংরেজী লিখিবার অক্ষতার ত্রুটি মার্জ্জনীয় নহে। ছেলেরা নিজে, এবং শিক্ষা প্রণালী উভয়ই, বিশেষ করিয়া শিক্ষার প্রণালীই, ইহার জন্য দায়ী।

বিদেশে ভ্রমণের সময় আমাদের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে একটা কথা মনে হইয়াছিল। এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমাদের দেশীয় কার্য্যে লোক নিয়োগ করিবার সময় বিদেশীয় ডিগ্রীর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমূহ ক্ষতি করিতেছি, এইগুলিকে হেয় করিতেছি। ইহার আর এক কুফল

হইতেছে যে, বহু যুবক শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ায় বিলাতের হাই কমিশনারের আপিস হইতে শুনিয়াছি যে, বৎসরে এই জন্য ভারতের প্রায় এক কোটি টাকা বিদেশে যায়। নূতন জ্ঞানলাভের জন্য বিদেশে যাওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু আমাদের যুবকেরা প্রায়ই কেবল চাকুরির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিরাচরিত পন্থাই অবলম্বন করে। জাপান যেমন করে সেইরূপ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেই নিযুক্ত করা উচিত এবং জ্ঞানোন্নতির বা উচ্চতর শিক্ষার জন্যই তাহাদিগকে বিদেশে পাঠান উচিত, বিদেশের ডিগ্রীর জন্য নয়।

শিক্ষায় তাড়না ও আদর

কোন কোন পরিবারে ভাল বন্দোবস্ত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই শিশুদিগের তাড়নাই নিয়ম। ইহাতে তাহাদের মনের বিকাশ হয় না। বাপমাকে, বিশেষতঃ বাপকে, যমের মত ভয় করে। তারপর পাঠশালার গুরুমহাশয়ের শাসন। পাঠশালায় এই তাড়নায় উৎপত্তির কারণ অনেকটা শিক্ষণীয় বিষয়ের দোষে এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষাপদ্ধতির দোষে। শিশুকে, বুঝুক না বুঝুক, কেবল মুখস্থই করান হয়।

অনেক ভ্রান্ত ধারণার দরুণ আমরা বহু অনিষ্ট সাধন করি। যে ছেলের মুখে কথা নাই; শান্ত, শিষ্ট, গোবেচারীটি, যেখানে রাখিবে সজীব মাংসপিণ্ডবৎ সেখানেই বসিয়া থাকিবে, 'চোখে রাখিলে চোখ্ জুড়ায়' এই শিশুই হইল দেশের আদর্শ। মনের বিকাশের আদর্শ ত এইরূপ। আবার কোন কোন গৃহস্থের গৃহিণীর মুখে শুনা যায়, 'আমার এই ছেলেটি লক্ষ্মী, এতটুকু খায়, অমুকটা রাক্ষস, এতগুলো খায়।' বলিষ্ঠ সন্তান গড়িবার ধারণা কিরূপ দেখুন। তার উপর স্কুলকলেজের

শিক্ষা ক্রমাগত বই, নোটবুক, গৃহশিক্ষকের বুলি, শিক্ষকের নোট গলাধঃকরণ এবং পরীক্ষাগৃহে উদ্গীরণ, যে যত করিতে পারিবে তাহারই তত বাহাদুরী। ফল যে unpractical বি-এ, এম্-এ তাঁহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শিক্ষার অভাবে এবং দোষে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক মনোবৃত্তির যে বিকাশ হয় না, এই কথা বলিতে আরও অনেক কথা মনে উদয় হয়। নানাদিকের চাপে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত লোক যেন পঙ্গু হইয়া যাইতেছে। জন্মাবধি পিতামাতার ভীতি, গুরুমহাশয়ের ও শিক্ষকের ভীতি, জমিদারদের পশ্চিমা দরোয়ান এবং পুলিশের পশ্চিমা কন্‌ষ্টেবলের ভীতি, চাকুরিজীবীর আপিসের সাহেবের ভীতি, এইরূপ নানা ভীতির জন্য এবং শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালীর এবং এমন কি যে কয়জন শিক্ষা পায় শিক্ষার দোষে তাহাদেরও জীবনের স্ফূর্ত্তি হইতে পাইতেছে না। তাহার উপর অন্নসমস্যা কি ভীষণ অবস্থায়ই উপস্থিত হইয়াছে।

বালকবালিকাদের শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা কোমলমতি না হয়। লেখাপড়ার জন্য তাড়নাই নিয়ম, কিন্তু অপর দিকে বালকবালিকাদিগকে এরূপে মানুষ করি যে, তাহারা বড় বয়স পর্য্যন্ত মায়ের আঁচল ধরিয়াই থাকে, ইংরেজীতে যাহাকে spoon feeding কহে। শিক্ষার সময়ে যত কষ্টসহিষ্ণু, নিজের উপর নির্ভরশীল হয় ততই ভাল। তাহারা নিজেরা কাপড় কাচিবে, জুতা বুরুশ করিবে, বিছানা করিবে, কাপড়চোপড় বই ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিবে। হাজার অবস্থাপন্ন হইলেও চাকরের উপর নির্ভরতা শেখান উচিত নয়। আমি দেখিয়াছি বি-এ পড়ে এমন বয়স্কপুত্র গঙ্গাপার হইয়া শিবপুর যাইবে, ইহার জন্য তাহার পিতামাতা ভাবিয়া অস্থির। এরূপ ছেলে

শিক্ষিত হইলেও তাহার দ্বারা কেরাণীগীরি বা নিয়মবাঁধা চাকুরি ছাড়া আর কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। ছেলে 'ডাংপিটে' হওয়া ভাল, 'ভালমানুষ' হওয়া ভাল নয়। আজকাল যে বাঙ্গালীর ছেলে পায়ে হাঁটিয়া বা সাইকেলে চড়িয়া সাহসিকতার পরিচয় দিতেছে ইহা সুলক্ষণ। শিক্ষার সময়ে দল বাঁধিয়া excursion করা, অন্যত্র গিয়া নানা জিনিষ দেখিয়া শুনিয়া, দিন কয়েক কাটাইয়া আসা ভাল। এইরূপ শিক্ষার দ্বারা বাঙ্গালীর ছেলের ঘর-কুনোমী দূর হইবে। ঘর-কুনোমীর জন্য বাঙ্গালী প্রায় সুবিধা হইলেও অন্যত্র যাইতে নারাজ।

সাধারণ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লিখনপঠনক্ষমতা অর্জ্জন শিক্ষার সোপান মাত্র। বি-এ, এম্-এ পাশ করিলেও শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে এবং আমাদের আধুনিক প্রণালীতে ত থাকেই। নিম্নলিখিত সকল বিষয়গুলিই যে শিক্ষা দ্বারা হয় না সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ।

প্রথম, ভব্যতা—সমাজে এবং সকল লোকের সহিত, এমন কি, পৃথিবীর সকল লোকের সহিত স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাবে কোন বিষয়েই কাহারও মনে অসন্তোষের সৃষ্টি না করিয়া মিশিবার এবং একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতার নাম ভদ্রতা। জ্ঞানোন্মেষের পর হইতেই বালক-বালিকাদের অনেকে মিলিয়া খেলাধূলা, কাজ ও পাঠ এই ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। অনেকের সঙ্গে মেলামেশা না করিলে মিশিবার ক্ষমতা হয় না। মেলামেশা হইতেই সহানুভূতি হয়, সহানুভূতি দ্বারাই সহযোগে কাজ করিবার সুবিধা হয়। সমবায়ে এবং যৌথভাবে কাজ করিবার ইহাই ভিত্তি।

অষ্ট্রেলিয়াবাসী এক বৈজ্ঞানিক জাপানে এক বৈজ্ঞানিক সভায় যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সভার কার্য্যের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও জাপানী বালকবালিকাদের ভব্যতা জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা যে অত্যুক্তি নয় তাহা আমি জাপানে পাঁচ মাস থাকিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। যখনই যে-কোন জাপানীর বাড়ী গিয়াছি গৃহস্বামী, গৃহিণী, বালকবালিকা সকলেই আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই আপন করিয়া লইয়াছে। এমন ভাব আর কোথাও দেখি নাই। ইহা বালকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। Peers বা অভিজাত বংশে এই বিষয়ে শিক্ষার এমন বন্দোবস্ত যে, যে-কোন সভাসমিতিতে মাত্র দুইটি কথা এবং চাল চলনে কাউণ্ট, ভাইকাউণ্টের ভব্যতা প্রকাশ পায়। আর বাঙ্গালায় সেদিন সিটি কলেজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে কলেজের, অতএব বয়স্ক ছাত্রদের, তাহাদেরই শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক মৈত্রর প্রতি ব্যবহার কি পরিচয় দেয়? মতের মিল হইল না বলিয়া ভব্যতা রক্ষাও নিষ্প্রয়োজন? রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত বলিয়া বিবেচিত তাঁহাদেরও ব্যবহার দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়। যিনি উঠিয়া বসিয়াছেন গাড়ী যেন তাঁরই নিজস্ব সম্পত্তি, অপরকে উঠিতে দিবেন না। রুগ্ন বৃদ্ধ বা স্ত্রীলোককেও, এমন কি, দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও স্থান দিবেন না। শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও সামান্য ক্লাব করিয়া একসঙ্গে খেলা ও গল্প করিতে পারে না, নূতন নূতন দল গড়িয়া বসে। ক্লাব সম্বন্ধে আর একটা কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। ক্লাব করিয়া নিয়মিত চাঁদা না দিলে যে ক্লাব চলিতে পারে না একথা অনেকেই বুঝেন না। অতএব বাঙ্গালীর ক্লাব বাঙ্গালীর শৈথিল্যের নিদর্শনস্বরূপ চলিতে থাকে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যায়।

উপরে যে দলাদলির কথা বলিলাম দেশের সর্ব্বত্রই ইহা বিদ্যমান। বাঙ্গালী দূরদেশে গেলেও দলাদলির ভাব ত্যাগ করিতে পারে না। এই দলাদলি অধিকাংশ স্থলে ব্যক্তিবিশেষের কলহপ্রিয়তা ও তজ্জনিত আক্রোশ হইতে উৎপন্ন হয়। কতক একদিকে এবং কতক অপর দিকে যোগ দিয়া দল পাকাইয়া তোলে এবং কলহকারী ব্যক্তিদের আক্রোশ মিটাইবার যন্ত্রস্বরূপ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এমন অভদ্র ব্যবহার ও কার্য্য ঘটে যে, বিদেশে সমস্ত বাঙ্গালীজাতির কলঙ্ক হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকুরিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যেই এই ব্যাপার বেশী ঘটে। ইহা স্বাধীন চিন্তা, সৎসাহস ও ভব্যতা জ্ঞানের অভাব এবং ক্ষুদ্রচিত্ততার পরিচায়ক। ইহার কুফল হইয়াছে এই যে, বাঙ্গালী সঙ্গতিপন্ন হইলেও অতি অল্প স্থলেই সমাজের হিতকর কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে এবং তাহাও আবার পরে দলাদলির জন্য হয় পঙ্গু হইয়া থাকে, না হয় ভাঙ্গিয়া যায়। যেখানেই শিখেরা যায় ছোটবড় সব স্থানেই গুরুদ্বারা স্থাপন করে। ব্রহ্মদেশের বহুস্থানে গুরুদ্বারা আছে। হংকঙে পাঁচ জন শিখ পুরুষ ও রমণী ভ্যানকুভার যাইবার পথে জাহাজ হইতে নামিল। এক বৃহৎ নৌকা গুরুদ্বারার পতাকা উড়াইয়া আসিয়া তাহাদিকে লইয়া চলিল। আর্য্যসমাজীরা যেখানে যায় স্কুল ও মন্দির স্থাপন করে। অপর প্রদেশীয় মুসলমান মাত্র কয়েকজন হইলেও মস্‌জিদ্‌ ও স্কুল গড়িয়া তুলে। দলাদলির আর এক কুফল এই যে, বাঙ্গালী কোথাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকে না বলিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে। যখন এই কথা লিখিতেছি তখন ব্রহ্মদেশে নানা কারণে বাঙ্গালীদের অত্যন্ত বদ্‌নাম হইয়াছে। রেল ইত্যাদি হইতে বেশীর ভাগ বাঙ্গালীই বিতাড়িত হইতেছে। কিন্তু ইহাদের জন্য একটা কথা বলিবার কোন প্রতিষ্ঠান নাই। সমগ্র ভারতীয়দের পক্ষে একমাত্র বোম্বাই প্রদেশীয়

ব্যবসাদারদের দ্বারা গঠিত Indian Chamber of Commerce যাহা কিছু করে। অথচ ব্রহ্মদেশের প্রতিষ্ঠাবান এবং সঙ্গতিপন্ন উকিলদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী।

ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা অনেকেই জানেন। এই দুইটি প্রায় সাত শত বৎসরের পুরাতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পরে ইংলণ্ডে অনেক নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও এই দুইটিই প্রধান। ইহাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, ভদ্রলোক (gentleman) গঠন, আর উপায় হইতেছে প্রথম সম্মিলিত ক্রীড়া, দ্বিতীয় একপ্রবাস এবং তৃতীয় অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন পাঠ। অন্ততঃ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল যুবক ইহাদের পাশ ডিগ্রি লইয়া বাহির হইত, তাহাদের জ্ঞানের প্রশস্ততা বেশী নয়; কিন্তু এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত সকলেরই ক্ষুদ্রচিত্ততা, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ইত্যাদি দূর হয় এবং সকলেই ভদ্র হইয়া বাহির হয়, নিজের চিন্তাশক্তি চালনা দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, যাহারই সামর্থ্য আছে সে দল গঠন ও পরিচালনার ক্ষমতা দ্বারা দলপতি হয় আর যাহারা তাহার উপযুক্ত নয়, তাহারা দলপতির আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করে। ইটন, হ্যারো ইত্যাদি ইংলণ্ডের পাব্‌লিক স্কুলেও শিক্ষার এই লক্ষ্য। এইরূপে শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারাই ইংলণ্ড শাসিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং ইংরেজের রাজত্ব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন বলিয়াছিলেন যে, ওয়াটার্লু যুদ্ধজয়ের প্রধান অস্ত্র ইটনের খেলার মাঠ, অর্থাৎ ইটন্ স্কুলের খেলার মাঠে যোদ্ধারা বা সৈন্যাধ্যক্ষরা যে-শিক্ষা পাইয়াছিল সেই শিক্ষার জোরেই বীর নেপোলিয়নকে পরাস্ত করা সম্ভব হইয়াছিল।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও উপরোক্ত শিক্ষার তুলনা করিলে

সহজেই বুঝা যাইবে আমাদের দলাদলির মূল কোথায়। এখন দেশের কল্যাণের জন্য সকল শ্রেণীর বালকবালিকাদের একত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তেলি, ডোম প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব, সহানুভূতি ও একসামাজিকত্ব সৃষ্টি করিতে হইবে। একসামাজিকত্ব বলিতে পরস্পরের সহিত বিবাহ প্রচলন বলিতেছি না, ঘৃণা ও দ্বেষের অভাব এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং পরস্পরের সদ্ভাবকেই একসামাজিকত্ব বলিতেছি।

মানুষ মানুষকে অপবিত্র বা নীচ বলিয়া ঘৃণা করিবে না। দৈহিক ও চারিত্রিক অপবিত্রতাই ঘৃণার্হ।

একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া খেলা বা কোন কাজ করায় মানুষের মন উদার হইতে সাহায্য করে। এমন খেলা যাহা তাহা একা একার নয়, অনেকের সাহচর্য্যের উপর উহার হারজিত নির্ভর করে; যেমন ফুটবল, ক্রিকেট। খেলাতে হারজিত মানিয়া লইবার শিক্ষা মস্ত বড় শিক্ষা। উপরে কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইটন ইত্যাদি পাব্লিক স্কুলের যে সম্মিলিত ক্রীড়ার কথা বলিয়াছি তাহাতে কি দেখিতে পাই? কাহারও নিজের হারজিতে ততটা দুঃখ বা আনন্দ নাই যতটা দলের, কলেজের, স্কুলের, ইয়ুনিভার্সিটির বা দেশের হারজিতে হয়। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের নৌকাচালন-প্রতিযোগিতা যেরূপ সমস্ত সাম্রাজ্যের ব্যাপার, সেইরূপ কালিফর্ণিয়ায় ষ্টানফোর্ড ও কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বলখেলা এবং জাপানেও ওয়াসেডা এবং কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের বলখেলা দেশব্যাপী ব্যাপার। ইহাতে সমাজাত্মবোধ এবং দেশাত্মবোধ জন্মে এবং বাড়ে। এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীরও মনোগত ভাব কি? আমার এবং আমার পরিবারের হইলেই হইল, অপরে এবং সমাজ, দেশ

গোল্লায় যাক, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার কি লাভ ? এই কারণেই ঐ সকল দেশ উন্নত, আর আমাদের দেশের অধোগতি। যতদিন না আমাদের সমাজাত্মবোধ ও দেশাত্মবোধ জন্মিতেছে ততদিন আমাদের উন্নতি নাই। ড্রিল এবং ড্রিলের প্রতিযোগিতা, সকলে কিম্বা দলে দলে ড্রিল করিয়া গ্রাম ভ্রমণ কিম্বা গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণ। পূজা-পার্ব্বণ উৎসবের সময় বাদ্যসহ ড্রিল। এইরূপ কত রকমে মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠ ভাব হইতে পারে। বাগান, অল্প জমীতে চাষ, পল্লীশ্রী সাধন, রাস্তাঘাট, বেড়াইবার ও খেলিবার স্থান তৈয়ারী, বেড়া লাগান, কচুরী পানা উঠান ইত্যাদি কাজ স্ফূর্ত্তির সহিত সাহচর্য্যে করা যায়। ইহাতে সহযোগ, সহানুভূতি ও আত্মীয়তা হয় এবং সহযোগে কাজ উদ্ধার করিবার ক্ষমতা জন্মে। জাপানে দলাদলির পরিবর্ত্তে সহযোগে কাজ করিবার রীতিই প্রবর্ত্তিত আছে। যাহারা মাছ ধরে তাহাদের সমিতি, যাহারা চাষ করে তাহাদের সমিতি, যাহারা শিক্ষক তাহাদের সমিতি, যাহারা তীর্থে যায় তাহাদের সমিতি, এইরূপ নানা সমিতি গঠনের প্রথা আছে। সমিতির কার্য্য হয়ত কেবল আলোচনা। কাজেকাজেই তাহারা যাহাতে হাত দেয় তাহাতেই সাফল্য লাভ করে।

আমোদ-প্রমোদ সামাজিকত্ব সৃষ্টির একটি উপায়। সকল গ্রামেই এমন আমোদ-প্রমোদ গীতবাদ্যের প্রচলন প্রয়োজন যাহাতে সকলেই যোগদান করিতে পারে। আমোদ-প্রমোদ, হাসি-খুশী স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ত বটেই, তাহা ছাড়া সহানুভূতি সৃজনের ইহা এক প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব ইহাকে শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও সৎসাহস সৃষ্টি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরণ—নিজের ক্ষমতার উপর এমন বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে,

জগতের সকল কাজই চেষ্টা করিলে করিতে পারি, যেন কেবল নিজ পল্লী, জেলা বা দেশকেই আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি না থাকে, পৃথিবীর কোন স্থানই দূর বা অগম্য মনে না হয়, যেখানেই হউক গিয়া বসবাস ও কাজ করিবার প্রবৃত্তি যেন হয়। ইংরেজ এই গুণেই আজ পৃথিবীর চতুর্থাংশ দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে। পৃথিবীতে এখনও এমন স্থান আছে যেখানে আমাদের বসবাসের উপায় হয়; যেমন এই সেদিন ব্রেজিল আহ্বান করিতেছিল। বহু জাপানী গিয়া সেখানে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। মেক্সিকো, পেরু, চিলি ইত্যাদি দেশেও জাপানীরা যাইতেছে। চীনারাও কত স্থানে গিয়া ঘরবাড়ী করিয়া বসিতেছে। এক ঘরে সঙ্কীর্ণ স্থানে অধিক লোক বাস করিলে যেমন সকলেরই স্বাস্থ্যহানি হয়, সেইরূপ প্রকৃতির নিয়ম হইতেছে, যদি কোন স্থান যত লোক পোষণ করিতে পারে, সেখানে যদি তাহার অপেক্ষা বেশী জনতা হয় তাহা হইলে খাদ্যাদির অভাবে ও রোগের বিস্তারে কতক মরিবে এবং কতক মরণোন্মুখ হইয়া থাকিবে। ইংরেজ এবং অপরাপর পাশ্চাত্য জাতীয়েরা বাহিরে গিয়া বৃদ্ধির সুবিধা পাইতেছে। অতএব আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় তাহাদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের বাহিরে যাইবার ইচ্ছাও নাই এবং সুবিধাও অল্প, কিন্তু চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকিলে নিশ্চয়ই স্থান পাওয়া যাইতে পারে। দুনিয়ার খবর এবং মন প্রশস্ত হয় এমন শিক্ষা পাইলে এই ইচ্ছা ও চেষ্টা সহজেই হইবে। এখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী ঘর হইতে বাহির হইয়া উন্নতির চেষ্টা না করিয়া আত্মীয়ের গলগ্রহ থাকিতে লজ্জা বোধ করে না।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি কোন কোন শ্রেণীর লোক বিদেশে আদরিত হয় এবং হইবে। কেরাণী, উকিল, এমন কি শ্রমিকও গৃহীত হইবে

না। সকল দেশই চায় কৃষকশ্রেণীর লোক যাহারা কৃষির উন্নতি করিতে পারে। জাপানী কৃষকশ্রেণীর ন্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, এরূপ শ্রমসহিষ্ণু এবং নির্দ্দোষ কৃষক বোধ হয় খুব কম দেশেই আছে। ভারতীয় কৃষকও শ্রমসহিষ্ণু, নির্দ্দোষ ও নৈতিক চরিত্রে উন্নত এবং কর্ম্মপটুতায়ও জাপানীদের সমান হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার অভাবে, এমন কি, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় কৃষকও অন্যদেশে গিয়া সেই দেশের লোকের সহিত মিশিতে পারিবে কি না সন্দেহ, কৃষকশ্রেণী প্রথমে আদরিত হইলে ও তাহারা গিয়া বসবাস করিলে পরে অন্যান্য শ্রেণীর আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়।

শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে কাতর বলিয়া বাঙ্গালীর বিশেষ অখ্যাতি আছে। বনজঙ্গলে, মাঠেঘাটে, রৌদ্রবৃষ্টিতে করিতে হয় এমন অনেক বড় বড় উচ্চ বেতনের চাকুরির পথ বাঙ্গালীর জন্য খোলা নয়। রাজপুরুষদের ধারণা বাঙ্গালী ইহার উপযুক্ত নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর খালাসীরা ধর্ম্মঘট করে। ব্রহ্মদেশে এই কোম্পানীর বহু জাহাজ চলে। সারেঙ ও খালাসীগণ সকলেই চট্টগ্রামবাসী মুসলমান। ধর্ম্মঘটের সময় অনেক নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া জাহাজ চালাইবার চেষ্টা করা হয়। সেই সময় আমি কার্য্যোপলক্ষে প্রোম শহরে ছিলাম। দেখিলাম কয়েকজন বাঙালী যুবকও এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইরাবতীর কূলে সন্ধ্যার সময় তাহাদের সহিত আলাপ হয়। আমার সঙ্গে এক ইংরেজ বণিক ছিলেন। তিনি, 'বেঙ্গলী বাবু'রা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া হো হো করিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া কিপ্‌লিং প্রভৃতি লেখকগণ বাঙ্গালীর বাক্‌পটুতা, পরিশ্রমে কাতরতা, প্রকৃত কাল্পনিক বহু দোষের

শ্লেষাত্মক বর্ণনা তাঁহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল পুস্তক পৃথিবীর যাহারা ইংরেজী জানে তাহারা, বিশেষ করিয়া ইংরেজ ও আমেরিকানরা পড়ে এবং ইহা হইতেই 'বেঙ্গলী বাবু'র ধারণা করিয়া লয়। উক্ত ইংরেজ বণিকের সহিত আলাপে বুঝিলাম ইহার 'বেঙ্গলী বাবু'র ধারণার ভিত্তিও ইহাই। বাঙ্গালীর ভীরুতা ও সাহসিকতার অভাব কি ভাবে জগতে রাষ্ট্র হইয়াছে তাহা হয়ত সাধারণ বাঙ্গালী অনেকেই খোঁজ রাখেন না। মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তক বোধ হয় পৃথিবীর এমন জাতি নাই যে পড়ে নাই। এই পুস্তক নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। ইহাতে কোন এক দেশীয় রাজার মুখ দিয়া বলা হইয়াছে—যে-দিন ইংরেজ এদেশ ছাড়িবে, সেই দিনই বাঙ্গালা দেশে একটি পয়সাও থাকিবে না এবং কোন বাঙ্গালী রমণীর সতীত্বও থাকিবে না। অপর প্রদেশীয়েরা বাঙ্গালার সমস্ত লুট করিবে, এমন কি, তাহাদের নারীদিগকেও; বাঙ্গালীরা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে। পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেব স্যর মাইকেল ওডায়ার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার রচিত পুস্তকে বলিয়াছেন যে, গত মহাযুদ্ধের সময় পঞ্জাবের অতি ক্ষুদ্রতম জেলা হইতে যত সৈন্য পাওয়া গিয়াছিল সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে তত পাওয়া যায় নাই।

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী কি এতই শ্রমকাতর ও ভীরু? রৌদ্রে, বৃষ্টিতে দিবারাত্র খাটিয়া বাঙ্গালার মাটিতে সোনা ফলায় কাহারা? আমি দেখিয়াছি, বর্ষাকাল, অন্ধকার রাত্রি, দ্বারকেশ্বর নদীতে ভরাবন্যা, কিন্তু রাত্রিতেই অপর পারের গোয়ালাদের গ্রাম হইতে ঘৃত দধির প্রয়োজন। বলিবামাত্রই দুইজন কৃষিজীবীশ্রেণীর লোক সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইয়া গেল ও দধি ঘৃত লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল। রূপনারায়ণের

উপরিভাগের নাম দ্বারকেশ্বর; নদী ক্ষুদ্র নয়। ইহাতে কেহই মনে করিল না যে, একটা কিছু বাহাদুরীর কাজ হইল ।আবার এই শ্রেণীরই এক ব্যক্তিকে কোন কার্য্যোপলক্ষে পুরায় লইয়া গিয়াছিলাম। কে তাহাকে বলিয়াছিল যে, চাষের ক্ষেতে মলত্যাগ করিলে পাহারাওয়ালা ধরিবে; অতএব যেন পায়খানা ব্যবহার করে, কিন্তু পায়খানা দেখাইয়া দেয় নাই। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি সে কেহ উঠিবার আগে বাড়ীর উঠানেই মলত্যাগ করিয়াছে অথচ উঠানের কোণেই পায়খানা ছিল। গ্রামে সে একজন চালাক লোক বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু বাহিরের শিক্ষার অভাবে একেবারে জড়ভরত। কলকারখানায় এবং মোটর চালনা ইত্যাদি নানাকার্য্যে কলিকাতা এবং বাঙ্গালার অন্যান্য শহরে ভিন্ন প্রদেশীয়দিগকে দেখিয়া হা-হুতাশ করি, কিন্তু যে-সব শ্রেণীর লোক এই কাজ করে বাঙ্গালার সেই শ্রেণীর লোক প্রায় পল্লীর বাহির হয় না। স্যর মাইকেল ওডায়ারের উপরোক্ত অভিযোগের উত্তরেও এই কথা বলা যাইতে পারে। পঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, রাজপুতানা প্রভৃতির যে সকল শ্রেণীর লোক সৈনিকের কাজ করে বাঙ্গালার সেই সকল শ্রেণীর লোক পাওয়া গেলে সৈন্য কম হইবে না এবং শিক্ষিত হইলে তাহারা সাহস ও বলবীর্য্যে অন্যান্য সৈনিকের অপেক্ষা হীন বিবেচিত হইবে না ইহা নিঃসন্দেহ। আসল কথা হইতেছে যে, শিক্ষা নাই, এবং চলন নাই, ইংরেজীতে যাহাকে tradition বলে। বাঙ্গালা দেশেরই চট্টগ্রামবাসী মুসলমানগণ উৎকৃষ্ট খালাসীলস্করূপে প্রসিদ্ধ। শিক্ষার অভাবে ও দোষে এবং চাকুরির আয়াসভাবের দরুণ যে শিক্ষিত এবং ভদ্রশ্রেণীর অধিকাংশই শ্রমকাতর তাহা অস্বীকার করিবার নয়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা পাইলে এই দোষ শীঘ্রই দূর হইবে।

হইতে পারে ওডায়ার ও কিপ্‌লিং উচ্চমনা ইংরেজশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

নয় এবং ক্ষুদ্রমনা ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজগণই জগতের সমক্ষে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগকে, হীন করিবার জন্য মিস্ মেয়োকে এইরূপ পুস্তক লিখিবার প্ররোচনা দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে এবং যদিও উচ্চমনা ইংরেজগণ বুঝিয়াছেন মিস্ মেয়োর পুস্তক আর যাহাই করুক ইংরেজ-শাসনপ্রথার দোষই জগতের সমক্ষে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই সকল নিন্দাবাদের প্রতিকার সম্ভাবনা কম, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কাজেই বাঙ্গালীর ইহাতে বহু ক্ষতি হইয়াছে। বাঙ্গালী ফৌজের সাহায্যেই একদা ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালীই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু করিয়া ইংরেজ শাসকদের অপ্রিয় হইয়া উঠে। কিপ্‌লিং প্রভৃতির বাঙ্গালী-বিদ্বেষের মূলে এই অপ্রিয়তা ও বাঙ্গালী-ভীতি। এইরূপ নানা কারণে বাঙ্গালীর এখন যুদ্ধবিভাগে স্থান নাই। বাঙ্গালার পুলিশ কন্‌ষ্টেবল পর্য্যন্ত ভিন্ন দেশীয়। শাসনের কড়াকড়িতে বাঙ্গালার জমিদারদের সিপাই, শড়্‌কি, লাঠিয়াল দমিত হইয়াছে। এমন কি, এখন পল্লীগ্রামে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর লোক লাঠিখেলা ইত্যাদি করিলে পুলিশের উৎপীড়ন হয়। এই সকল কারণে বাঙ্গালা নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তার উপর বাঙ্গালী-ভীতি বা বাঙ্গালীর প্রতি আক্রোশবশতঃ অপর প্রদেশের লোক বাঙ্গালীর ঈর্ষা করে এবং সর্ব্বত্রই এখন বাঙ্গালীদের প্রতি অপ্রীতি দেখা যায়। অনেক সময়ে নানা কাজে বাঙ্গালীদিগকে বাদ দেওয়া হয়। বাঙ্গালী যদি ইহা না বুঝিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, বাঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই দলাদলি কলহ ভুলিয়া এক হইয়া সহযোগে বাঙ্গালার উন্নতির চেষ্টা না করে, তাহা হইলে বাঙ্গালীর আর কোন আশা নাই। অপর প্রদেশীয়ের পক্ষে বাঙ্গালীর দমনই এখন বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু ইহার

প্রতিকারের জন্য এখন এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে যাহাতে বাঙ্গালী নিজের শক্তিতে বিশ্বাস না হারায় এবং কার্য্য দ্বারা জগতের সমক্ষে ঐ সকল নিন্দকদের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

অল্প বয়স হইতে সকলেই যাহাকে সব রকম কাজে হাত চালাইতে পারে এরূপ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। এই রকমের খেলাধূলা, ছুতারের কাজ, ছোটখাট বাগান ইত্যাদি সহজেই করা যায়। এইরূপে মনে ধারণা ও বিশ্বাস জন্মে যে সব কাজই করিতে পারি। মনের উপর কার্য্য করে এরূপ অনেক বিষয় বলিয়া বুঝাইয়া দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

বালকবালিকাদিগকে জগতের ইতিহাসের বিবরণ, উন্নতির কারণ ইত্যাদি এমনভাবে বুঝাইতে হইবে যে, তাহাদের মনে কিছু-না-কিছু করিবার অদম্যস্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠে। বড় বড় সম্রাট, যোদ্ধা, নাবিক, পর্য্যটক, দেশ-আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবক প্রভৃতির কার্য্যের যতদূর সম্ভব নিদর্শন চিত্রে দেখাইয়া ও বিবরণ দিয়া মনে গাঁথিয়া দেওয়া উচিত যে, তাহারাও আমাদেরই মত মানুষ এবং আমরাও এইরূপ কাজ করিতে পারি। পৃথিবীর নানাদেশের শহর, বন্দর, বড় বড় ইমারত ও পর্ব্বত, জলপ্রপাত ইত্যাদি নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের চিত্র দেখাইয়া তাহাদের পরিচয়;—নানাজাতীয় লোকের এবং তাহাদের পোষাকপরিচ্ছদ, পরিবার-পরিজন, আচারব্যবহারের পরিচয়সূচক চিত্র দেখাইয়া বিবরণ;—বৃক্ষলতাদি, চা, কাফি, কোকো, রবার, ইক্ষু, সিঙ্কোনা, নারিকেল ইত্যাদির চাষ—এই সকল হইতে উৎপন্ন এবং এই সকল উৎপন্নের যৌথকারবারমূলক ব্যবসায় বিবরণ; ধান, কার্পাস গম, ইক্ষু ইত্যাদি শস্যের এবং নানাবিধ ফলের নির্ব্বাচন ইত্যাদির দ্বার উন্নতির বিবরণ, নানাদেশের এই সকল আমদানি

রপ্তানীর ব্যবসার বিবরণ ;—নানাদেশের জীবজন্তুর বিবরণ এবং জীবজন্তু হইতে উৎপন্নের ব্যবসা যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যাণ্ডের উল, জাপানের রেশম, নানাদেশের মাংস, ডিম, দুধ, মাখনের ব্যবসা, গরুঘোড়া প্রভৃতির নির্ব্বাচন দ্বারা উন্নতির বিবরণ, মানবের উন্নতির ইতিহাসের বিবরণ, অনুন্নত ও উন্নতজাতি সকলের তুলনা ; অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকার জঙ্গলপূর্ণ স্থান এখন কিরূপ ইন্দ্রপুরীতুল্য স্থানে পরিণত হইয়াছে তাহার ইতিহাস, পৃথিবীর অস্বাস্থ্যকর নরকতুল্য স্থান সকল কিরূপে স্বাস্থ্যকর স্বর্গে পরিণত হইতেছে তাহার চিত্র সহ বিবরণ, বড় বড় সেতু, সামুদ্রিক সংবাদবাহী তার, টানেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, মোটর, বেতার এবং তাহাদের কারখানা ও নির্ম্মাণের চিত্র সহ বিবরণ ইত্যাদি দ্বারা মন প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং পৃথিবী কি ভাবে চলিতেছে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কোন স্থানে একেবারে না গেলেও আজকাল ছায়াচিত্র ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই সকল বাস্তব বলিয়া অনুভূত হয়। এ সমস্তই আমাদের মত মানুষের কাজ। কোটী কোটী টাকার বড় বড় কারবার সাধারণ লোকের নিকট দশ বিশ টাকা করিয়া সংগ্রহ করিয়া চলে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব ও উন্নতির ধারণা হইলে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয় ; মনে উচ্চাশা জন্মে ; উচ্চাশাই উন্নতির মূল। শত বাধাবিঘ্ন ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মত উড়িয়া যায়। সামান্য কুলীমজুরের অবস্থা হইতে বড় বড় ব্যবসায়ী, ধনী, কর্ম্মবীর ও দানবীর বাহির হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ আদর্শই মানুষকে উন্নত করে। মানুষেরই ছেলেকে যদি জঙ্গলে পশুর মধ্যে রাখ তাহা হইলে সেও পশুতুল্য হইবে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রাখ মনের ভাব আর ব্যবহার তাহাদেরই মত হইবে।

ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে রাখ ভদ্র হইবে। উন্নত জাতিসকলের মধ্যেই আমাদেরও স্থান, এই ভাব শৈশবকাল হইতে সকলের মনে গাঁথিয়া দেওয়া আবশ্যক।

এই রূপেই কলিযুগবাদ, অদৃষ্টবাদ ও কূপমণ্ডূকত্ব দূর হওয়া সম্ভব। জগৎ কি এবং কি ভাবে চলিতেছে এবং আমরাও জগতের এক অঙ্গ ইহা ধারণা হইলে অপর অঙ্গের ন্যায় কার্য্য করিবার এবং তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিবার প্রবৃত্তি হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে নিউ ইয়র্কের পথে রেলে কয়েকজন আমেরিকান ব্যবসাদারের সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, আমেরিকায় আমরা 'আমি কে এবং কি' এই বিষয় চিন্তা করিয়া নিজদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করি। আমার বাবা বা ঠাকুরদাদা বড় ছিলেন বলিয়া নিজেকে বড় মনে করি না।

যে সকল দেশ উন্নত সে সকল দেশে নানা রকম কলকব্জা নির্ম্মাণ, রেল, রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী প্রস্তুত, জাহাজনির্ম্মাণ, কলকারখানা চালনা, জাহাজ চালনা, মোটর ও উড়োজাহাজ চালনা ইত্যাদি অর্থোপার্জ্জনের বহু পথ প্রশস্ত। আমাদের দেশে সে পথ এখনও অতি অপ্রশস্ত হইলেও ক্রমেই তাহা প্রশস্ততর হইবে। এই সকল কার্য্যে তাহারাই পারদর্শী হয়, যাহারা শৈশবকাল হইতেই যে-কোন কার্য্যে হাত চালাইবার কৌশল জানে। অতএব শৈশবকাল হইতেই নিজ হাতে সকল কাজ করিবার প্রবৃত্তি ও সাহস সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক।

তৃতীয়, জীবনের সকল কাজেই শৃঙ্খলা ও দায়িত্বজ্ঞান জন্মান।

বাঙ্গালীদের সকল কাজেই 'গজহংস' বা 'হচ্ছে-হবে' ভাব। কোন কাজেই শৃঙ্খলা নাই। কোনও কাজই সময়মত করিবার

আগ্রহ বা চেষ্টা নাই। কাজেকাজেই কোন কাজই আমরা সময়মত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করিতে পারি না। 'হচ্ছে-হবে' ভাবের দরুণ দায়িত্বজ্ঞানও কম হয়। এই কারণে আমরা কোন ব্যাপারই বেশ ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না। শৃঙ্খলার ভাব ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা করিতে হয় এবং অভ্যাসের দ্বারা ইহা চরিত্রে এবং কার্য্যে বদ্ধমূল হয়। জীবনের প্রত্যেক সাধারণ ব্যাপার,—খাওয়া, খেলা, নিদ্রা, পাঠ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজ সময়মত করিবার অভ্যাস রাখা নিতান্ত দরকার। এই অভ্যাসের দরুণ সকল কাজেই আপনা আপনিই শৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে এবং কাজটা সময়মত হাসিল করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। পাশ্চাত্য দেশীয়দের খাওয়া-শোওয়াও যন্ত্রের মত চলে। জাপানও ইহা করিতেছে। দেশশুদ্ধ সকলেই এক সময়ে খায়, এক সময়ে কাজ করে এবং এক সময়ে খেলে। ইহাতে কাহারও কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না এবং কাহাকেও অপরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। বাড়ীর চাকর পর্য্যন্ত সময়মত কাজ করিয়া দিয়া খালাস। অসময়ে প্রভু চাকরকে ডাকিবে না; কাজেই চাকরেরাও বাধ্য হইয়া সময়মত নিজের নিজের কাজ হাসিল করে। আর আমাদের চাকরেরা হচ্ছে-হবে করিয়া গড়িমসি করিয়া দিন কাটায়। আপিসের বাবুরা বাধ্য হইয়া সকাল বেলা সপ্তাহের কয়দিন সময়মত খান; রাত্রে খান বারটায় এবং ছুটির দিনে বেলা তিনটায় ও রাত্রি বারটায়। আমরা সভা-সমিতিরও সময় ঠিক রাখিতে পারি না। 'নেটিভ টাইম্' বলিয়া বিদ্রূপাত্মক কথা আমরা নিজেরাই ব্যবহার করি। মূলে এই ভাবের দরুণ আমরা অনেকেই কথায় ও কাজে কোন সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা করি না। আমাদের প্রতিদিনকার সকল কাজেই বিশৃঙ্খলা। দৈনিক বিলাতে আমেরিকায় এবং এখন জাপানেও

থিয়েটারে বা বড় বড় বক্তৃতায় ভিড় হইবার সম্ভাবনা থাকিলে লোকে জায়গা না পাইবার আশঙ্কায় আগে হইতেই গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে। রেলে ট্রামে টিকিট কিনিবার সময়ও সেইরূপ সকলে পশ্চাতে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকে। যে পশ্চাতে আসিয়াছে সে পশ্চাতে দাঁড়াইবে এবং পশ্চাতে প্রবেশ করিবে। ঠেলাঠেলি নাই, ভিড় নাই। অভ্যাসের দরুণ সকল কাজেই ইহাদের শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব-জ্ঞানের জোরেই মুষ্টিমেয় ইংরেজ এত বড় হইয়াছে ও এত বড় দেশ শাসন করিতেছে এবং বড় বড় ব্যবসা কারখানা ইত্যাদিও চালাইতেছে।

জাপানীরা সকল কাজই বেশ শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহিত সম্পন্ন করে। কাজেকাজেই ইহারা সকল বিষয়েই শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করে। আমি যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে জাপানেই ক্ষৌরকার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অপর কোন দেশের নাপিত এমন সুশৃঙ্খলার সহিত ও সুন্দরভাবে এই কার্য্য করে না।

এস্থলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার কথা কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। ভারতীয়েরা নোংরা বলিয়াই খ্যাত। যে-ঘরে থাকেন অনেকেই সেই ঘরে যেখানে সেখানে থুতু ফেলেন। আমাদের অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরেও শৃঙ্খলার বিশেষ অভাব। যদি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকিতে, সব জিনিষই সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের মনও সুন্দর হয়। অভ্যাস করিলেই ইহা অতীব সহজসাধ্য হইয়া যায়। আর আমার বিশ্বাস, ইহাতে সৌন্দর্য্যজ্ঞান বাড়ে। জাপানীদের ঘর ছোট এবং আস্‌বাবপত্র নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে যথাস্থানে একটি চিত্র এবং টবের উপর একটি ক্ষুদ্র গাছ

(dwarfed plant) বা বাঁশের চোঙ্গায় সাজান কয়েকটি ফুলের ডালই ঘরটিকে কত সুশ্রী করে। কোন একটি উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ে এইরূপ ফুলের ডাল সাজান এবং এমন কি, দোয়াত কলম কাগজটি পর্য্যন্ত কিরূপে সাজাইয়া রাখিতে হইবে তাহার শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়াছিলাম। কত অভিনিবেশ সহকারে এবং মনকে একাগ্র করিয়া এই কাজ করা হয় তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে বুঝাইতে সক্ষম হইব না। সকল কার্য্যেই শৃঙ্খলার বিষয়ে জাপানীদের মনের একাগ্রতা ইহাদের সাফল্যের প্রধান উপায়। বিলাতে পার্কে বাগানে ছিন্ন কাগজপত্র, লেবুর ছাল ইত্যাদি ফেলিবার জন্য বাক্স বা খাঁচা রাখা আছে এবং নোটিশ দিয়া অনুরোধ করা আছে যে,যেন কেহ এখানে ওখানে কাগজ ইত্যাদি ফেলিয়া সকলের আনন্দের স্থান বাগানের সৌন্দর্য্যহানি না করেন। জাপানে হয়ত জলের নালার ধারে কয়েকটি মাত্র এব্ড়োথেব্ড়ো পাথর সাজান আছে, কিন্তু তাহা এমন ভাবে যে, এই জাতির শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান কত ইহা হইতেই বুঝা যায়।

চতুর্থ, নৈতিক জীবন-গঠন—ব্যবহারিক জীবনে নীতির সহিত ধর্ম্ম জড়িত। হিন্দু ব্যতীত অপর তিন প্রধান ধর্ম্মাবলম্বীমধ্যে, অর্থাৎ খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব্বে যাহাই হউক এখন কোনরূপ ধর্ম্মশিক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুকে দেওয়া হয় না এবং ইহার বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তাও খুব কম লোকেই অনুভব করেন। দেখিয়া শুনিয়া যে যাহা শিখে তাহাই তাহার ধর্ম্মশিক্ষা। কাজেকাজেই আদর্শ অতি উচ্চ হইলেও শিক্ষার অভাবে হিন্দুদের অধিকাংশের পক্ষেই ধর্ম্ম এখন মাত্র আচারব্যবহারেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা

একত্রে মিলিত হইয়া ঈশ্বরার্চ্চনা করে। ইহা পরস্পরের মধ্যে একতা ও সহানুভূতি বৃদ্ধির সহায়তা করে। হিন্দুদের দুর্গা, কালী ও অপরাপর দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে বহু লোক একত্রিত হইলেও, মাত্র জনতাই হয়; সকলেই ঈশ্বরার্চ্চনার ভাব লইয়া উপস্থিত হয় না। প্রায় সকলেই দর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই যায়। ঈশ্বরাধনায় পুরোহিতরূপী দালালের বন্দোবস্ত ইহার প্রধান কারণ। সময় ও নিয়মমত একসঙ্গে বহুজনের একত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবার বন্দোবস্ত হিন্দুগণ করিতে পারে। তবে ইহাও মাত্র সাময়িক। দেবদেবী বা অব্যক্ত ঈশ্বর, যে-যাহারই আরাধনা করুক, নিয়ম ও সময়মত প্রাত্যহিক অর্চ্চনার বন্দোবস্ত বিশেষ আবশ্যক। ইহা অনেকে মিলিত হইয়া একত্রে করিতে পারিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়; হিন্দুদিগের জাতিবিভাগ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভাব ইত্যাদি বহু বাধা আছে; কেবল শিক্ষার দ্বারাই ক্রমে এই সকল দূর হইতে পারে। এখন যাহারা মিলিত হইয়া এইরূপ অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহাদেরই মধ্যেই ইহার ব্যবস্থা প্রচলিত উচিত।

মকৃতব, মসজিদের ধর্ম্মশিক্ষায় এবং সাধারণ পাদ্রীদের বাইবেল শিক্ষায় অনেকটা গোঁড়ামী এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করে। আবার ব্যবহারের পার্থক্যের দরুণ, এবং সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যখন আচার-ব্যবহারেই আবদ্ধ তখন হিন্দুদের মধ্যেও প্রচুর গোঁড়ামী রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেও বাঙ্গালা দেশে হিন্দু-মুসলমান প্রায় সর্ব্বত্রই বেশ মেলামেশা করিয়াই বাস করে। এখন যে কোথাও কোথাও বিদ্বেষ ভাব দেখা যায় তাহা অপর প্রদেশ হইতে আনীত অথবা স্বার্থান্বেষী লোক বিশেষের প্ররোচনাজনিত। সাধারণ বিদ্যালয়ে সকল ধর্ম্মাবলম্বী বালকবালিকাদের একত্রে শিক্ষা বাঞ্ছনীয় এবং কিছুদিন পরে তাহা

হইবেই হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ে কোন এক বিশেষ ধর্ম্ম ধর্ম্মশিক্ষারূপে শিক্ষা না দিয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের মহান নীতিগুলি ও পুরাণাদির শিক্ষার ন্যায় রূপকভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের অগ্রণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মিলিত চেষ্টায় এরূপ নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা সহজেই সম্ভব। ইহা দ্বারা ধর্ম্মবিদ্বেষ দূর হইবে ও দেশবাসী সাধারণের মঙ্গল হইবে।

প্রত্যেক বালকবালিকাকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কোন জাতি আজ নৈতিক চরিত্রে উন্নত থাকিলেও নূতন নূতন বংশকে যদি প্রকৃত নীতি সকল শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে জাতির নৈতিক পতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের হইয়াছেও তাহাই, ফলে দলাদলি কলহবিবাদ বাড়িয়া গিয়াছে।

শিক্ষার অভাবে ধর্ম্মের নামে যে অযথা কলহবিবাদ বর্ত্তমান তাহাতে মনে হয় ধর্ম্মশিক্ষার প্রচলনেও এখন ব্যাঘাত আসিবে। কিন্তু নীতিশিক্ষা বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নয়। পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও কর্ত্তব্য, আত্মীয়স্বজনের প্রতি, সমাজের লোকদিগের প্রতি এবং ভিন্নদেশীয়দের প্রতি ব্যবহার ও কর্ত্তব্য, সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা, ক্ষুদ্রতা পরিহার ও উচ্চচিন্তা, মিতব্যয়িতা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক জীবনে বিশুদ্ধতা ইত্যাদি জীবনের, সমাজের এবং দেশের হিতকর গুণাবলির সৃজন ও বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া নীতিশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

পঞ্চম, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মোটামুটি তত্ত্বগুলির জ্ঞানার্জ্জন—খাদ্য নির্ব্বাচন ও ব্যবহার ইহার মধ্যে ধরিতেছি। রোগের প্রতিষেধক সাধারণ নিয়মগুলি এমন ভাবে মনে গাঁথিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে,

তাহাদের নিয়মিত পালন অভ্যাস হইয়া যায়, যথা, ভাল করিয়া হাত না ধুইয়া খাদ্যদ্রব্যে হাত না দেওয়া; খাদ্যে ধূলা পড়িতে বা মাছি ইত্যাদি বসিতে না দেওয়া। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগের জন্য সাধারণ সতর্কতা এবং নিজেদের ও শিশুদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলিরও জ্ঞান এইরূপ প্রয়োজনীয়। শীতের সময় গরম জলে রোজ স্নান করিলে যে সর্দ্দি লাগিয়াই থাকে এবং শিশুদিগকে রোজ স্নান না করাইলে যে তাহাদের অসুখ বেশী হয় ইহা অনেকেরই ধারণার অতীত।

বৈজ্ঞানিকদের মতে যাহাদের পিতামাতা দীর্ঘজীবী এবং সুস্থ, যাহারা আপন আপন দোষে শরীরে রোগের বীজ বপন না করে, যাহাদের মানসিক স্ফূর্ত্তি থাকে, যাহারা পান, আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়-ভোগ প্রবৃত্তি, সকল বিষয়েই মিতাচারী; যাহারা নিয়মিত রূপে পরিমিত মানসিক ও দৈহিক ব্যায়াম করে, যাহারা যথেষ্ট পরিমাণ মুক্ত বায়ুতে জীবনযাপন করে, যাহারা ধীর ও শান্ত এবং যাহারা সকলকেই ভালবাসিতে পারে তাহারাই দীর্ঘজীবন লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা সকলের মনে এই সকল গাঁথিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ষষ্ঠ, ব্যায়াম—জাপান প্রভৃতি সকল দেশেই স্কুল কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ব্যায়ামও একটি বিষয়। জাপানে ইহা ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। প্রত্যেক স্কুলের সংলগ্ন ক্রীড়া, ড্রিল ইত্যাদির জন্য মাঠ ছাড়া, বৃষ্টি বা বরফপাতের সময় যাহাতে ব্যায়ামের ব্যাঘাত না হয় তাহার জন্য বড় বড় ব্যায়াম-হল্ আছে। দিনের মধ্যে অঙ্ক, সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষার যেমন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে ব্যায়ামের জন্যও সেইরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীরা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই হলে আসিয়া ব্যায়াম-শিক্ষকের উপদেশমত

ব্যায়াম করে। বালিকাদের স্কুলেও এই নিয়ম। টোকিওর এক উচ্চ শ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ে বেলা দুইটার সময় ব্যায়াম-হলে ড্রিলের মতই বেশ দ্রুত অঙ্গচালনা, লম্ফঝম্ফপূর্ব্বক ব্যায়াম হইতেছিল। এই স্কুলের মাঠে প্রায় এক সহস্রেরও উপর ছাত্রী আমার সম্মুখে তাহাদের ড্রিলের কসরৎ দেখাইয়াছিল। এক বৃহৎ নর্ম্ম্যাল স্কুলে বেলা নয়টার সময় ব্যায়াম-হলে এক শ্রেণীর যুবকদের ব্যায়াম দেখিয়াছিলাম। জাপানের প্রত্যেক যুবককে দুই বৎসর সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। নানা কষ্ট সহ্য করিতে হইলেও এই শিক্ষা সকল লোকেরই মহৎ উপকার করে।

শরীরগঠনের জন্য যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, নিয়মিত ব্যায়ামেরও তেমনি প্রয়োজন। দুই চারি দিন চলাফেরা না করিয়া যদি কেবল শুইয়া থাকা যায় তারপর চলা অত্যন্ত কষ্টকর হয় ও গা টলমল করে। কোন হাত যদি না নাড়িয়া কেবল ঝুলাইয়া রাখা যায় তবে সেই হাতখানা সরু হইয়া যায়। সমস্ত শরীর যদি রীতিমত চালনা না হয় তাহা হইলে তাহা পুষ্ট হইতে পারে না। শরীরগঠন এবং সুস্থ রাখিবার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম নিতান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া বালকবালিকার যখন শরীর বর্দ্ধিত ও গঠিত হইতেছে তখন ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই সকল উন্নত দেশেই শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ব্যায়ামেরও স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে গেলেই আমাদের বালকবালিকা, যুবকযুবতী, প্রৌঢ়প্রৌঢ়া সকলের দেহের গঠনের সম্পূর্ণ পুষ্টতার অভাব স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশেই পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোক

এবং যাহারা বাহিরে চলিয়া ফিরিয়া শ্রমের কাজ করিয়া বেড়ায় এমন লোহার, ডোম, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির স্ত্রীলোকের দেহের গঠনের পার্থক্য সকলেরই নজরে পড়ে।

বাঙ্গালা দেশের জলহাওয়ায় নিয়মিত ব্যায়ামের বিশেষ প্রয়োজন। যেখানে অতি শীত বা বনজঙ্গল ও পাহাড়ের সহিত লোকদিগকে লড়াই করিতে হয়, বাধ্য হইয়া তাহাদের শ্রমসহিষ্ণুতা ও লড়াই করিবার ক্ষমতা বাড়ে, যেমন—গুর্খা। জাপানে প্রত্যেক শিশুর ও বালকের, এমন কি যুবকেরও অতি ছোট করিয়া চুল ছাঁটা। শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন যে, ইহাতে ঠাণ্ডা ও রোদ লাগিয়া শিশুদের কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে এবং এই জন্যই ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ ছোট চুল রাখা হয়। বাঙ্গালা দেশের আব্‌হাওয়ায় নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা, পরিশ্রমের কাজ দ্বারা বিশেষ করিয়া ভদ্রশ্রেণীর সকলেরই শরীর গঠন করা প্রয়োজন। ব্যায়াম শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত।

সপ্তম, সঙ্গীত—সকল উন্নত দেশেই সঙ্গীতও বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় এবং আমাদের দেশেও ইহা হওয়া উচিত। সঙ্গীতের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রমকাতরতা দূর করিতে, মনের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করিতে এরূপ দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা ছাড়া আত্মীয়তা স্বজন এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিবর্দ্ধনেরও ইহা এক উত্তম উপায়। শিক্ষা করিতে পারিলে সকলের পক্ষেই সঙ্গীত জীবনের সম্পদ। শিক্ষার সময় প্রত্যেকের অন্ততঃ সঙ্গীতের অ আ-র সহিত পরিচয় হয় এমন শিক্ষার আয়োজনের দরকার।

অষ্টম, সাধারণ জ্ঞানার্জ্জন—ইহার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়।

(১) ভাষা ও সাহিত্য। বঙ্গভাষার ভিতর দিয়াই ইংরেজী ব্যতীত পরবর্ত্তী বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) ভূগোল বা ভূপরিচয়—পল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার, বাঙ্গালার, ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর পরিচয়।

(৩) ইতিহাস—পল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার, বাঙ্গালার ভারতবর্ষের এবং সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জাতির উন্নতি-অবনতির মোটামুটি ইতিহাস।

(৪) রাষ্ট্রনীতি—প্রধানতঃ দেশের শাসনযন্ত্র কিরূপে চালিত হয় এবং অন্য উন্নত দেশ সকলের শাসনযন্ত্রের সহিত মোটামুটি তুলনা।

(৫) অর্থশাস্ত্র (Economics) ও ব্যবসায়িক ভূপরিচয়—কোন্ দেশের কি কি প্রধান উৎপন্ন এবং ঐ সকল উৎপন্নের ব্যবসার মোটামুটি বিবরণ এবং সাধারণ ভাবে অর্থশাস্ত্রের মোটামুটি জ্ঞান যাহাতে নানা দেশের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা হয়।

(৬) অঙ্ক—পাটিগণিত, শুভঙ্করী, বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

(৭) জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির জীবনেতিহাসের সাধারণ জ্ঞান—জীবতত্ত্ব (Zoology) এবং উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany)—বিজ্ঞানের মধ্যেই ধরা হয় এবং আমাদের দেশে এক ভুল ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান অতি কঠিন ও সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। এই কারণে আমাদের ম্যাট্রিকুলেশনে পর্য্যন্ত জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই। জাপানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চাঙ্গের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি এবং ইহাদের জীবনেতিহাসের জ্ঞান দ্বারা আমরা কত শিক্ষা ও আনন্দ পাইতে পারি। এই শিক্ষার সহজেই বন্দোবস্ত

করা যায়। এইরূপ শিক্ষার দরুণ জাপানীদের পারিপার্শ্বিকের সাধারণ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ এবং ইহা হইতে কত আনন্দ জাপানীরা উপভোগ করে সেই সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিতেছি। আমাদের দেশে কত রকমের বৃক্ষলতা, ফলফুল, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ আমাদের চারি ধারে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা ইহাদের প্রতি মোটেই তাকাই না। এই সকল বিষয়ে আমরা একেবারেই অন্ধ। এই সকল হইতে শিক্ষা ও আনন্দ লাভে আমরা বঞ্চিত রহিয়াছি। অপর দিকে ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে উপকারীও বটে। অতএব এই সকলের জ্ঞানালোচনা শিক্ষণীয় বিষয়ের অঙ্গীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

জাপানে প্রায় সকলেই টবের উপর নানা রকম গাছ, এমন কি, ঘাস পর্য্যন্ত জন্মাইয়া ঘরে রাখে। জাপানী পাইন গাছকে (দেবদারু জাতীয় একপ্রকার গাছ) ছোট করিয়া টবে জন্মান একটি আর্ট। এই সকলের প্রদর্শনী হয়। দুই হাত উঁচু গাছ হয়ত শতবর্ষের উপর এক টবে জীবিত আছে। শীতকালে অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং তুষার ও বরফপাতের জন্য গাছে পাতা থাকে না এবং কীটপতঙ্গ সবই নিদ্রিত থাকে। গ্রীষ্ম পড়িলে পুনরায় কীটপতঙ্গেরা বাহির হয়। তখন নানা রকমের পোকা ছোট ছোট খাঁচায় বিক্রয় করা হয়। ইহাদের মধ্যে উইচিংড়ি একটি। ছোট ছোট খাঁচায় উইচিংড়ি বিক্রয় হয় ও লোকে ক্রয় করিয়া বসিবার ঘরে রাখে এবং ইহারা যে চিরিক্ চিরিক্ চিরিররং শব্দ করে জাপানীরা এই শব্দকে সঙ্গীত-আখ্যা দিয়া এই সঙ্গীত উপভোগ করে। ইহাদিগকে রাখিবার জন্য একটি ছোট খাঁচার মূল্য কয়েক আনা হইতে চৌদ্দ পনর টাকা। কোন একটি উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় গ্যাসের চুলায় রন্ধন-শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়াছিলাম। নানা রকম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ইহারা আমাকে খাওয়াইয়াছিলেন। একটি মিষ্টান্নের

নাম 'সূর্য্য এবং পাইন গাছ', একটির নাম 'শরতের চন্দ্র', অপর একটির নাম 'পাহাড়ের শীর্ষে বরফ'। ব্যবসাদার নিজের জিনিষের মার্কা দেয় 'পাইন গাছ', 'ফুল গাছ', 'ফুজি পাহাড়' ইত্যাদি।

কীটপতঙ্গের জীবনেতিহাসের পরিচয়ের দরুণ যে-সকল কীট ফসল নষ্ট করে তাহাদিগের উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করে। ইহার জন্য পল্লী বিদ্যালয়ের ছুটি দেওয়া হয় এবং কৃষকশ্রেণীর বালকবালিকারা ক্ষেতে গিয়া পোকা নাশ করে।

(৮) বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—ইহার মধ্যে পদার্থবিদ্যা (Physics), রাসায়নিক বিদ্যা (Chemistry) এবং এই সকলের ভিত্তির উপর আধুনিক যত প্রকার বড় বড় আবিষ্কার—যেমন রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারবার্ত্তা, মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদি হইয়াছে, সেই সকল বুঝিবার মোটামুটি জ্ঞান। জাপানে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নিক বিদ্যার মোটামুটি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। মধ্যবিদ্যালয়ে (আমাদের ম্যাট্রিকুলেশনের সমান) ত এই সকল শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থাই আছে।

(৯) ইংরেজী ভাষাজ্ঞান—ঐ গুলির উপর লিখিয়া পড়িয়া বুঝিয়া কাজ চালাইবার মত ইংরেজী জ্ঞান বর্ত্তমানে প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষা এখন প্রায় সার্ব্বজনীন ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইংরেজীর সাহায্যে সমস্ত সভ্যদেশের সহিত কাজকর্ম্ম, ব্যবসা ইত্যাদি চালান যাইতে পারে। জাপান, ইতালী প্রভৃতি দেশে ইংরেজী ভাষা বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় বিষয় সকলের তালিকাভুক্ত। ভারতবর্ষেই ভিন্ন প্রদেশীয় অনেকের সহিত ইংরেজী ব্যতীত ভাবের আদান প্রদান সম্ভব নহে এবং যাহা কিছু আধুনিক উন্নতি বা আবিষ্কার তাহা সহজেই ইংরেজীতে লিখিত পুস্তক হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

এইগুলিই হইল সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিতদের শিক্ষা যে কত অসম্পূর্ণ তাহা সহজে বুঝা যাইবে এবং এই সব শিক্ষার বন্দোবস্ত যত ভালরূপে হইবে শিক্ষা ততই উৎকৃষ্টতর হইবে। কেবল পুস্তক হইতে সাধারণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, এমন কি, বলিতে গেলে ইহার অল্প অংশই সম্ভব। শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশ উপযোগী করিয়া ধাপে ধাপে শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইবে জ্ঞানার্জ্জন ও চরিত্রগঠন মাত্র—পাশ করা নয়। ইতিহাস ইত্যাদির গল্প বক্তৃতার দ্বারা মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে, কেবল পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিলে ইতিহাসে জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় অর্জ্জিত হইতে পারে না। অনুসন্ধিৎসা জাগিলে বালকবালিকারা নিজেই পুস্তক হইতে বেশি শিখিবে।

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না। উচ্চশিক্ষা জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার ভিত্তি আমাদের রহিয়াছে। উল্লিখিতরূপ সাধারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষানুষ্ঠান গঠন করিতে পারিলে এমন সামঞ্জস্য ও ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে যাহা দ্বারা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারে। সকল বালকবালিকারই উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত ভুল।

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পাঠ বয়স্ক এবং সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা বহু পরিমাণে সাধিত হয়। কিন্তু আমাদের নিরক্ষরতা যতদিন দূর না হইবে ততদিন আমাদের দেশে ইহা আশা করা যায় না। পত্রিকাদি ছাড়া বিলাত ও জাপানে সাধারণ বয়স্কদিগের শিক্ষার নানাপ্রকার বন্দোবস্তের মধ্যে কয়েকটির কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি।

সাধারণ লোকের এবং বয়স্কদের (এবং সেই সঙ্গে শিশু, বালকবালিকা, সকল শিক্ষার্থীরও) আধুনিক সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুব্যবস্থা যেমন ইংলণ্ডে আছে এমন আর কোথাও দেখি নাই। ইংলণ্ডের সকল স্থানের সহিত পরিচয়ের সুবিধা আমার হয় নাই। লণ্ডন শহরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথাই এখানে বলিব। এখানে অনেক মিউজিয়াম (যাহাকে আমরা যাদুঘর বলি) আছে। ইণ্ডিয়া মিউজিয়ামে ভারতবর্ষের দ্রব্যসামগ্রী যাহা সংগ্রহ আছে ভারতবর্ষে কোথাও তেমন দেখি নাই। বিজ্ঞান মিউজিয়ামে এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত কলকব্জা, যন্ত্র, ঘড়ি, তাঁত, মুদ্রাযন্ত্র, জাহাজ, নৌকা, বাইসাইকেল, মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, টাইপরাইটার, অঙ্ক কষিবার যন্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদির এবং বেতার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে—সমস্তই পর পর সাজান আছে। এই সকল বিষয়ে প্রত্যহ বক্তৃতা দেওয়া হয়। বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞাপিত হয়। কয়েকজন মিলিয়া কোন বিষয়ের জ্ঞানের জন্য বক্তৃতার আবেদন করিলে তাহারও বন্দোবস্ত করা হয়। বৃটিশ মিউজিয়ামেও এইরূপ করা হয়। Imperial Institute নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন-প্রণালী বুঝাইবার জন্য কাঁচা মাল হইতে পূর্ণগঠিত যন্ত্রপাতি সকলই পর পর সাজান আছে, যেমন—ভারতের লাক্ষার চাষ ও লাক্ষা তৈয়ারি, কার্পাস চাষ, অষ্ট্রেলিয়ায় উলের চাষ ইত্যাদি। এই প্রদর্শনী ছাড়া নানা বিষয়ের বক্তৃতার আয়োজন করিয়া পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইয়া দেওয়া হয় এবং এইরূপ বক্তৃতা ছাড়া দিনে প্রত্যহ চারিবার চলচ্চিত্রের সাহায্য সব-কিছু দেখান হয়।

এই সমস্ত দেখিতে কাহারও অর্থব্যয় করিতে হয় না। যখন দরকার বোধ হয়, বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বক্তৃতা দিয়া চলচ্চিত্রের বিষয় চিত্র বুঝাইয়া দেওয়া হয়। চলচ্চিত্রের সম্বন্ধেও সময় নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে, যেমন নেল্‌সনের জীবনচরিত দেখাইবার সময়, স্কুলগুলির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে সকল বিষয়ে সিনেমা দেখান হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে দিতেছি। ইহার কোন কোনটি দিনে চারিবার করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া দেখান হয়। নেল্‌সনের জীবনী সাতদিন দেখান হইয়াছিল। আবার কোনটি কেবল একদিন দেখাইয়াই বন্ধ করা হয়।

১। With Captain Scott in the Antarctic (ক্যাপ্টেন স্কটের সহিত উত্তরমেরু ভ্রমণ)

২। Palavar—আফ্রিকার নিগেরিয়া প্রদেশে একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যপ্রণালীর চিত্র। চর্ম্মকৌপীন পরা আউরা ও আন্‌গাস জাতীয় অসভ্যদের রাজামহারাজারা মাত্র খাঁকি হাপপ্যান্ট এবং হাতকাটা কামিজ পরিহিত ইংরেজকর্ম্মচারীর পায়ে লুটাইতেছে। আবার যুদ্ধের সময় মাত্র রিভলভার্ লইয়া এই কর্ম্মচারী একাই হাজার হাজার বর্শা নিক্ষেপকারী অসভ্য যোদ্ধাদিগকে ভেড়ার পালের মত তাড়াইয়া দিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে শৈশবকাল হইতেই ইংরেজ বালকের মনে আফ্রিকান, ভারতীয় প্রভৃতি জাতি সকল হইতে ইংরেজের প্রাধান্য এবং সাম্রাজ্য শাসন ভাব জাগাইয়া দেওয়া।

৩। Nelson—আমেরিকান্‌দের যেমন ওয়াসিংটন্ (Washington) বীর (hero), ফরাসীদের যেমন নেপোলিয়ন্, ইংরেজদের সেইরূপ

নেল্‌সন্। দেশের জন্য ইহার জীবনপাত এবং আহত হইয়া জাহাজের এক অন্ধকার কক্ষে দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে ইহার মৃত্যু। বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগকে আনিয়া বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

4. History of Electricity (বিদ্যুৎ বা বিজলীর ইতিহাস)

5. Making of a Lead Pencil (লেড্ পেন্সিল প্রস্তুত-প্রণালী)

6. Denizens of the Garden (কীটপতঙ্গের জীবনী)

7. Cyprus (সাইপ্রাস দ্বীপের উৎপন্নাদির বিবরণ)

8. Eagles of the Sea (সামুদ্রিক ঈগলপক্ষী)

9. Australia and Tasmania (অষ্ট্রেলিয়া ও টাস্‌ম্যানিয়ার বিবরণ)

10. Birth of a Motor Car (মোটরগাড়ীর উৎপত্তি)

11. Making of a Cigarette (সিগারেট উৎপাদন)

12. Packing Eggs (ডিম প্যাক্ করার প্রণালী)

13 New Zealand (নিউজিল্যাণ্ডের বিবরণ)

14. The Cheese Industry (পনির উৎপাদন)

15. Golden Eagle (সোনার ঈগল)

16. With Cobham Round Africa (in Aeroplane) (উড়ো জাহাজে কবহামের সহিত আফ্রিকা ভ্রমণ—ইহাতে আফ্রিকাবাসীদের চিত্রসহ কিছু পরিচয় আছে)

17. The Potter's Art (চীনামাটির বাসন নির্ম্মাণ)

18. Making of Lead (সীসা উৎপাদন)

19. Manufacture of Tin Plate (করগেট ইত্যাদি নির্ম্মাণ)

20. Road Transport (মালপত্রাদি বহনের জন্য যানাদি)

21. Herring Fishery (হেরিং মৎস্যের চাষ ও ব্যবসা)

22. Bee Master (মৌমাছি-পালন-প্রণালী)

23. Production of Rice (ধানের চাষ এবং চাল প্রস্তুত-প্রণালী)

24. Food for Millions (লক্ষ লক্ষ নরনারীর আহার্য্য সংস্থান)

25. Canada's Fur Trade and Timber Industry (কানাডার লোম ও কাষ্ঠ শিল্প ও ব্যবসা)

ইহার সকলগুলি আমার দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

মিউজিয়মগুলির মধ্যে দুই-একটির সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। National Portrait Gallery তে বিখ্যাত লোকদিগের প্রতিকৃতি আছে, কোন কোন লোকের মাত্র একটি পদের রেখাকৃতি আছে, কাহারও কাহারও ছোট Plaster of Paris নামক মাটির মূর্তি আছে। একবার গ্যালারি'র ঘুরিয়া গেলেই কত লোকের কত কার্য্যকলাপের কথা মনে উদয় হয়।

কিউ বাগানে সকল দেশের সকল প্রকার বৃক্ষলতাদি, ফলমূল ও বীজের-প্রদর্শনী আছে ও নানাপ্রকার গাছ লাগাইয়া রাখা হইয়াছে, লোকে যাহাতে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতে পায়। গরম দেশের গাছগাছড়ার জন্য কাচের বড় বড় ঘর গরম করিয়া রাখা হইয়াছে। এইরূপ এক প্রকাণ্ড ঘরে আমাদের দেশের প্রকাণ্ড তালগাছ আছে। এই বাগানের এক ছোট মিউজিয়মে আমাদের দেশের নীলকুঠীর এক নমুনা আছে। ইহাতে লেখা আছে নদীয়া জেলার নীলকুঠী। কলিকাতা মিউজিয়মে কৃষ্ণনগরে গড়া ছোট ছোট পুতুল দিয়া যেমন কালীপূজা ইত্যাদি দেখান আছে ইহাও সেইরূপ। কৌপীনপরা গাঢ়নীল মাখান

কালো কালো কারিগরদিগকে বাঁদরের মত বোধ হইতেছে। কুঠীর মধ্যে একজন জুতা দ্বারা প্রহৃত হইতেছে, আর একজন গলাধাক্কা খাইয়া বহিষ্কৃত হইতেছে। ইণ্ডিয়া মিউজিয়মে বাঙ্গালী কামার ও স্যাকরার নমুনা আছে। কোথাও চাষী লাঙ্গল দিতেছে।

এই সকল দেখিয়াই ইংরেজ বালকবালিকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। কোথাও ভারতীয়দের ভাল চিত্র বা নমুনা দেখি নাই। কাজেকাজেই লণ্ডনে ছোট ছোট বালকবালিকা ভারতীয় দেখিলে ব্ল্যাকি, ব্ল্যাকি (Blacky, Blacky) বলিয়া বিদ্রূপ করে।

পশুশালা এবং জলজন্তুশালায়ও লোকের শিক্ষার বহু সুযোগ রহিয়াছে। লণ্ডনের পশুশালা ও জলজন্তুশালা যেমন সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। এখানেও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি বহু উচ্চ শিক্ষায়তনে নানা বিষয়ে উচ্চাঙ্গের জ্ঞানবিস্তারের জন্য বক্তৃতাদির বহু আয়োজন আছে এবং নিয়মিতরূপে তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

আজকাল টোকিও শহরে যেরূপ রেডিওর সাহায্যে সাধারণ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। মাত্র ত্রিশটি মুদ্রা হইলেই রেডিও যন্ত্র পাওয়া যায়। দোকানে, লোকের বাড়ীতে, যেখানে-সেখানে রেডিও আছে। রেডিও-কেন্দ্র হইতে সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি প্রতিদিনই হয়। এই সকল শুনিবার জন্য নিজেদের বাড়ীতে না থাকিলেও বড় বড় দোকানে বা অন্য স্থানে রেডিওর নিকট প্রায়ই জনতা হয়। সাধারণ গৃহস্থের ব্যায়ামের সুবিধার জন্য টোকিও শহরে এক জিম্‌নাষ্টিক্ লীগ খোলা হইয়াছে, প্রত্যহ সকালে রেডিও-সাহায্যে এমন সঙ্গীত বা ছড়া দেওয়া হয় যে, ইহার তালে তালে ব্যায়াম করা যায়। চিত্রসহ এই ব্যায়ামপ্রণালী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

জাতিগঠন, জাতিকে উন্নত রাখিবার এবং উন্নততর করিবার জন্য কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এখন বোধ হয় কিছু বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি।

প্রাথমিক এবং বয়স্কদিগের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য পরের বা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া আমরা কিরূপে তাহার আয়োজন করিতে পারি, জননী-প্রতিষ্ঠানের বিবরণে তাহা বলিব। যদি এই প্রতিষ্ঠান গঠন দ্বারা আমাদের বিধবা এবং যাঁহারা কুমারী থাকিবেন তাঁহাদিগকে শিক্ষা দ্বারা এই কার্য্যে সক্ষম ও ব্রতী করিতে পারি, আমার দৃঢ় ধারণা এই মহৎ কার্য্য সহজেই সাধিত হইতে পারিবে।

শিশুদের শিক্ষার আদর্শ এবং পিতামাতা ও অভিভাবক প্রভৃতির কর্ত্তব্য

শৈশবের ধর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া-শুনিয়া শিক্ষা। শিশুরা বয়স্কদিগকে যাহা করিতে দেখে তাহাই তাহারা আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং এই আদর্শ তাহাদের জীবনে বহু কাজ করে। দেখিয়া-শুনিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাদের যে ধারণা জন্মে তাহা পরে বাচনিক বা পুঁথিগত নীতিশিক্ষা দ্বারা পরিবর্ত্তন ও দূর করা কঠিন, এমন কি, অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব ভবিষ্যৎ বংশের চরিত্র-গঠনে পিতামাতা, অভিভাবক ও প্রতিবেশী প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তির মধ্যে শিশুরা বর্দ্ধিত হয় শিশুদিগের শিক্ষায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া সকলেরই সেই কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান হওয়া উচিত। এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, 'যদি চরিত্রবান লোক গড়িতে চাও তবে শিশুদিগকে সাত বৎসর বয়স-পর্য্যন্ত আমার নিকটে দাও, তারপর তাহাদিগকে যেখানে ইচ্ছা রাখ। এই সাত বৎসরে চরিত্রের যে-ভিত্তি গঠিত হইবে তাহা

আর কখনও বদলাইবে না।' সকল পিতামাতাই আপন সন্তানেরা ভদ্র, সৎ ও চরিত্রবান হয় সেই কামনাই করেন। অতএব পিতামাতার কর্ত্তব্য কেবল নিজ বাড়ীতে নয়, সর্ব্বত্র প্রতিবেশীদের সহিত, চাকর-বাকরদের সহিত, পরিচিত-অপরিচিত সকল লোকের সহিত সকল বিষয়ে ভদ্র ব্যবহার করা। শিশুকে পুস্তক হইতে পাঠ মুখস্থ করাইতেছি 'মিথ্যা কথা বলা মহা পাপ,' কিন্তু কোন অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক আসিলে শিখাইয়া দিতেছি, বলিয়া দাও 'বাবা বাড়ী নাই।' নিজ বাড়ীতে, প্রতিবেশীদের সহিত, পরিচিত-অপরিচিত কোন লোকের সহিত অভদ্র ব্যবহার করা, কলহ করা, উচ্চ অপ্রিয় বা ভদ্রসমাজে অব্যবহার্য্য কথা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা উচিত নয়। এমন বিবেচক পিতা দেখিয়াছি যিনি শিশুপুত্রকে হুঁকায় মুখ দিতে দেখিয়া নিজে তামাক খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং শিশুদিগের সঙ্গে ত নয়ই চাকর-বাকরদিগের সঙ্গেও তুইতুকারি করিয়া কথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আবার এমন অবিবেচক পিতাও বহু দেখিয়াছি যাঁহারা উচ্চ বংশের গর্ব্বে, উচ্চপদের গর্ব্বে, অনেক স্থলে হয়ত অসৎ এবং ভদ্রজনের অনুচিত উপায়ে অর্জ্জিত অর্থের গর্ব্বে প্রতিবেশীদের প্রতি, জ্ঞাতিকুটুম্বদের প্রতি, নিজেদের মনের অবজ্ঞার ভাব এমন ভাবে প্রকাশ করেন যে, সন্তানসন্ততিরাও এইভাবে সংক্রামিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ সন্তান হয়ত অনুকূল অবস্থার জোরে উচ্চ চাকুরি পাইতে পারে, কিন্তু খুব অল্প স্থলেই ভদ্র হয়। তাহারা প্রায়ই সকলের সহিত সহযোগে কাজ করিবার অযোগ্য হয় এবং দেশের ও সমাজের উপকারে প্রায়ই লাগে না। এমন কয়েকটি পরিবার দেখিয়াছি যেখানে কোন কারণে অবস্থা সচ্ছল হইলেও গার্হস্থ্য শান্তির অভাব ছিল এবং এই অশান্তির মধ্যে লালিত-পালিত সন্তানগণ শিক্ষিত হইয়াও

ভবিষ্যতে পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী কাহারও সহিত ভদ্র ব্যবহার করে নাই। কলহপূর্ণ কিম্বা বিদ্বেষভাবপূর্ণ আবহাওয়া শিশু বালক-বালিকাদের সৎশিক্ষার অনুকূল নহে। এক উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদারূঢ় পশ্চিম প্রদেশীয় ব্রাহ্মণের পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে আমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া 'বাঙ্গালী লোক মছলী খাতা হ্যায়, ছ্যাঃ' বলিয়া থুথু ফেলিতে দেখিয়াছি। ইহার পিতার বাঙ্গালীদের প্রতি বিদ্বেষভাব বেশ প্রকাশ হইয়া পড়িত এবং শিশুপুত্রটিও সেই বিদ্বেষভাব লইয়াই বর্দ্ধিত হইতেছে। 'ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইলে যে বিরোধ হয় তাহা বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। কারণ সন্তানেরা বিরোধপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া অন্ধবিশ্বাসের মত এই বিরোধভাব গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে হয় ত বিরোধের কোন কারণ থাকে না। এই ভাব শৈশবাবস্থায় অজ্ঞাতসারেই সৃজিত হইয়া জীবনব্যাপী হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে বংশে বংশে, পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, পূর্ব্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে এবং হিন্দুতে মুসলমানে বর্ত্তমান দলাদলি ও বিরোধভাবের ইহাই হইল মুখ্য কারণ। কাহারও সহিত কাহারও দেখাসাক্ষাৎ নাই অথচ বিরোধভাব বর্ত্তমান। ষাট বৎসরেরও অধিক বয়স্ক পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গবাসী দুই শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোককে প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপের মাত্র পনর মিনিটের মধ্যে বিনা কারণে বিরোধ ও শত্রুভাবাপন্ন হইতে দেখিয়াছি। ইহা শ্লেষপূর্ণ গালগল্প শ্রবণ বা পুস্তক পাঠ দ্বারা অজ্ঞাতসারে অর্জ্জিত বিরোধভাবের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশের কল্যাণের জন্য, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দেশবাসীর কল্যাণের জন্য, সমাজের বিভিন্ন স্তরের সকল লোকের কল্যাণের জন্য বয়স্ক নরনারী সকলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার এরূপ ভদ্র, কলহশূন্য, বিদ্বেষশূন্য, সহযোগ

ও সহানুভূতিপূর্ণ হওয়া উচিত যাহা আমাদের সকল শিশুর সম্মুখে কেবল এইরূপ আদর্শই প্রদান করিবে। ইহাই দেশবাসিগণের সহযোগে কাজ করিবার প্রধান ভিত্তি হইবে। সহযোগ ব্যতীত দেশের উন্নতি একেবারে অসম্ভব।

জননী-প্রতিষ্ঠান

পুস্তিকার অনেক স্থলে অপর দেশের নারীদিগের ন্যায় আমাদের দেশের নারীগণও নানারূপ মহৎকার্য্য সাধন করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাসের আভাস কিছু কিছু দিয়াছি। এখনই কত নারী সমাজ ও দেশহিতকর কত কার্য্য করিতেছেন তাহা লোকে জানে না। মধ্যে মধ্যে কাহারও কাহারও কথা মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে আমার মনে হয় এখন আমাদের সমাজবিধানে বিধবা হওয়ার দরুণ যাঁহারা কৃপার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন তাঁহারা আমাদের দেশের জন্যই বিধাতার দান, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতা ও সেবাধর্ম্মপরতা, দেশের ও দশের কার্য্যে যদি নিয়োজিত হয় তখন জগৎ ইঁহাদের কার্য্যে চমৎকৃত হইয়া যাইবে এবং দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে। ইঁহাদের শিক্ষা এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্যগ্রহণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমি একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদের জননীদের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে বলিয়া ইহার নাম জননী-প্রতিষ্ঠান রাখিতেছি।

প্রতিষ্ঠানের প্রথম কার্য্য হইবে জননীদের শিক্ষা, এমন শিক্ষা, যেন তাঁহারা বালকবালিকাদের প্রাথমিক এবং গৃহস্থ বয়স্ক নর-নারীদের যে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন দেখাইয়াছি তাহার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার উপর ধাত্রীবিদ্যা, সামান্য চিকিৎসা-বিদ্যা, স্বাস্থ্যবিদ্যা, কৃষি ও সমবায়ের জ্ঞান, গো-পালন, লাক্ষা ও রেশমকীট পালন এবং সকল ধর্ম্মের যতদূর সম্ভব তুলনামূলক জ্ঞান

ইত্যাদি তাঁহাদের শিক্ষার অন্তর্গত হইবে। কাহাকেও কাহাকেও জাপান ইত্যাদি অন্য দেশে পাঠাইয়া সহজ গৃহশিল্প ইত্যাদি শিখাইয়া আনা হইবে। সকলকে না হোক, কতকগুলিকে বয়ন ইত্যাদি শিল্পও শেখান হইবে। প্রতিষ্ঠানে একত্রে থাকিয়া শিক্ষা সাধিত হইবে।

শিক্ষার পর তাঁহাদের কার্যক্ষেত্র হইবে পল্লী। বাঙ্গালার পল্লীকে আমি যেরূপ জানি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, গ্রামের ভদ্র গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারা অতি সমাদরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। তারপর গ্রামবাসীরা যখন দেখিবে যে, ইঁহারা সকলের শিক্ষয়িত্রী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সুখেদুঃখে পরামর্শদাত্রী ও সাহায্যকারিণী তখন সকলেই ইঁহাদিগকে জননীর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে। তখন জননী-প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর চিন্তা করিতে হইবে না। গ্রামবাসীরাই জননীদের খাদ্যবস্ত্রাদির জন্য সাহায্য করিবে। গ্রামের প্রথানুসারে বিবাহ, জন্মোৎসব ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জননী-প্রতিষ্ঠানও সাহায্য পাইবে। জননীদের কর্তব্য হইবে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বজায় রাখা এবং নিজদিগকে এমন ভাবে গঠিত করা যেন তাঁহারা তাঁহাদের কঠোর ব্রত প্রফুল্লচিত্তে সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। একদিকে তাঁহারা হইবেন গ্রামবাসী সকলের জননী, সকল ধর্মাবলম্বী এবং সকল জাতিরই জননী ও নেত্রী এবং অপর দিকে সেবাধর্ম-সেবিকা।

গ্রামে গ্রামে তাঁহাদের কার্যের সহায়ক হইবে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত 'জননী' পত্রিকা। পত্রিকার উদ্দেশ্য হইবে সমসাময়িক জ্ঞানবিস্তার এবং সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসমবায়-শিক্ষা ও ব্যবসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচার এবং জননী-প্রতিষ্ঠানের কার্যের পরিচয়। প্রতিষ্ঠান বা পত্রিকা রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না।

গ্রামে যাহাতে সকল জাতির বালকবালিকার একত্রে শিক্ষা হয় জননীরা তাহার বন্দোবস্ত করিবেন এবং যাহাতে সকলে মিলিয়া খেলাধূলা করে, ড্রিল করে বা কোনরূপ হিতকর কার্য্য সম্পাদন করে তাহাও দেখিবেন। সেইরূপ গ্রামবাসী বয়স্ক নরনারীদেরও একত্রে মিলনের ও শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিবে। মিলন, 'জননী' পত্রিকা পাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষা চলিতে থাকিবে। সমবায়-শিল্প ইত্যাদি গঠনও জননীদের লক্ষ্য হইবে।

জননীরা সারাজীবন জননী-প্রতিষ্ঠানেই থাকিবেন। অসুস্থ অবস্থায় ও বৃদ্ধবয়সে জননী-প্রতিষ্ঠানই তাঁহাদিগকে আশ্রয়ে রাখিয়া তত্ত্বাবধারণ করিবে এবং ইহার জন্য কার্শিয়ং কিংবা অপর কোন উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকিবে।

দেশের নানা স্থানে, জেলায় জেলায় এবং কোন কোন জেলায় একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী হইবেন তাঁহাদেরই একজন যাঁহাকে 'মা-জননী' বলা হইবে। সকলগুলিই এক বৃহৎ দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত থাকিবে যাহার কর্ত্রীও হইবেন ইঁহাদেরই একজন যাঁহাকে 'মহাজননী' আখ্যা দেওয়া হইবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই মহাজননীর কর্ত্তৃত্বাধীনে এক পরিবার রূপে গণ্য হইবে। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্য্যই জননীদের দ্বারা সম্পাদিত হইবে। অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন জননী গ্রামে গিয়া কার্য্য করিবেন না এবং কোন স্থানে দুই জনের কম জননী থাকিবেন না। কার্য্যের অবস্থাবিশেষে কোন গ্রামে দুই জনের বেশীও থাকিতে পারেন। জননী-প্রতিষ্ঠানের এই কাঠামোর পরিচয় ব্যতীত আর বেশী কিছু এখানে বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করি না।

এখন প্রথম প্রয়োজন হইতেছে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করা

এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রথম প্রতিষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা, যেখানে এখনই প্রথম জননীদের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যও চলিবে। বাঙ্গালার শিক্ষিতা নারীদিগকেই এই কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জননী-ব্রত গ্রহণ করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অল্প-বয়স্কা বহু বিধবাকে পাওয়া যাইবে যাঁহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে দ্বিরুক্তি করিবেন না। শিক্ষিতা নারীরা জননী-ব্রত গ্রহণ না করিয়াও এই ভার গ্রহণ করিলে কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী, গৌরীমাতা প্রভৃতির দেশে প্রথমা জননীদের অভাব হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এইরূপ প্রস্তাব করিতাম না।

সকল কার্য্যের মূল অর্থ। অর্থের কথা সর্ব্বশেষে বলিতেছি, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এরূপ কার্য্যে অর্থের অভাব হয় না এবং হইবেও না। একবার প্রতিষ্ঠান খাড়া হইয়া উঠিলে জননীরা গ্রাম হইতে অতি সহজে কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহা বলিয়াছি। খাড়া না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসীদের বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে হইবে। দেশবাসীদের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা একবার ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিলেই আর কিছুর অভাব হইবে না। এই বিষয়ে শিক্ষিত, কৃতী, সঙ্গতিপন্ন স্বদেশবাসিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হইতে পারে না।

প্রতিষ্ঠানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি তথা হইতে জানা যাইবে

যে, এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে জননীদের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। তবে প্রথমে পুরুষের সাহায্য প্রয়োজন। নারীর বুদ্ধি, শক্তি ও নিঃস্বার্থপরতাতে আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসেই আমি দৃঢ়তার সহিত এই প্রস্তাব করিতেছি। প্রতিষ্ঠান খাড়া হউক, তখন আমার ন্যায় সকলেই নারীর শক্তিতে আস্থাবান্ হইবেন।

বাঙ্গালী পুরুষের শক্তিতেও আমার খুব বিশ্বাস আছে। প্রকৃত শিক্ষা পাইলে তাঁহারা সব কিছু করিতে পারেন। তবে পুরুষের দ্বারা এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িবার প্রস্তাব করি নাই, কারণ পুরুষের দ্বারা বালকবালিকা এবং পল্লীর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকগণের, শিক্ষা সেরূপ হইবার আশা নাই যেমন নারীর দ্বারা হওয়া সম্ভব।

আমরা দেখিয়াছি যে, সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলন হইলেও বহু বঙ্গ বিধবা পুনরায় বিবাহ করিবেন কি-না সন্দেহ। ক্রমে চির-কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনীদিগের সংখ্যাও বাড়িবে। এইরূপ বিধবা ও কুমারীদের দ্বারা জননী-প্রতিষ্ঠান বলীয়ান হইবে এবং দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইবে।

যদি এই জননী-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব জননীরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সকল বিষয়ে উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। যে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, অবরোধ-প্রথা নিবারণ এবং বিধবাবিবাহের প্রচলন জন্য বৈঠক, সভা, বক্তৃতা ইত্যাদি কত কি করিয়াও কিছু প্রতিকার হয় নাই, জননীরা যে অল্পদিনের মধ্যেই এই সকলের প্রতিকার সাধন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে জননী প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিধবা ও যাঁহারা চিরকুমারী থাকিবেন তাঁহাদের সমস্যার সমাধান কিরূপ মহৎভাবে সাধিত হইতে পারে তাহা একবার স্বদেশবাসিগণকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

নিজের কথা

শেষে আমার নিজের কথা কিছু বলা প্রয়োজন বিবেচনা করি। আমি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আর কয়েক বৎসর পরেই পেন্সন্ লইয়া আমি এবং আমার স্ত্রী এই কার্য্যে ব্রতী হইব এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। এখন আমি মৃতদার। অতএব জননী-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার জননীরা গ্রহণ করিবেন। প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় আমি আমার সমস্ত সময় নিয়োগ করিব। কার্য্যে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে কয়েকজন শিক্ষিত বন্ধুর সহিত আলোচনার ফলে এবং তাঁহাদের উৎসাহে এই বিষয় স্বদেশবাসীগণের গোচর করিবার জন্য এই পুস্তিকা প্রকাশ করিলাম। সহানুভূতি পাইলে এখনই কার্য্যারম্ভ করিবার অবসর পাইব।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৮	স্বরাট	স্ববাটী
১৩	২	একটা	একটি
১৮	৩	ব্রহ্ম দশের	ব্রহ্মদেশে
১৯	২০,২১	পাশমা	পানামা
২৮	১২	এত থাইয়ের	এই কথার
৩৪	২১	পত্তনিদারই	পত্তনিদারী
৫৭	২৪	ঋণ পরিশোধের	ঋণ দানের
৫৮	১১	যাহাতে সমবায়ে	সমবায়ে
৫৯	২৪	পঞ্চাশত	পঞ্চাশ
৬২	২২	প্রধান	ইহা প্রধান
৬৪	২০	দলেরও	দলের
৬৮	১৬	ম্যাক্ফারসন্	ম্যাক্কারিসন্
৭০	২০	রিবেটন্	রিবেটুস্
৭০		ফিফুয়্	কিকুয়্
৭১	১১	অপেক্ষা	অপেক্ষা শত করা
৭৩	৯	জাতাভাঙা রুটি	জাতাভাঙা
৭৫	৭	উপকারী যে সম্বন্ধে	উপকারী সে সম্বন্ধে
৭৭	১	সরাবন্	সংবিন্
৯২	৮	অসাহাসিকতা	অসমসাহসিকতা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৪	১৬	কারণে	কারণ
	১৯	কারণ	কারণে
১০১	১৩	বাঙ্গালীর	বাঙ্গালার
১০৮	১৩	এবং শেষ	এবং বিশেষ
১১৩	১৩	বলিতে	চলিতে
১১৫	১৭	অক্ষতার	অক্ষমতার
১১৬	১৪	তাড়নায়	তাড়নার
১২১	৯	একপ্রবাস	একত্রবাস
১২২	১২	যাহা তাহা	যাহা
১২৯	৪	যাহাকে	যাহাতে
১৩৫	১৪	প্রচলিত	প্রচলিত হওয়া
১৪৩	১৯	পাঠ	পাঠে
১৪৪	২৪	সাহায্য	সাহায্যে